টেষ্ট ক্রিকেটে বাঙ্গালী

শ্যামসুন্দর ঘোষ

টেষ্ট ক্রিকেটে বাঙ্গালী

শ্যামসুন্দর ঘোষ

৩৮, বাঙ্কুর এভিন্যু, কলকাতা-পঞ্চান্ন

প্রথম সংস্করণ
অক্টোবর, ১৯৮২

প্রকাশক :
ভারতী দত্ত
পুষ্প
১৩, বাঙ্গুর এভিন্যু
'বি' ব্লক
কলকাতা-৭০০ ০৫৫

মুদ্রক :
শ্রীমতী অরুণা শীল
শাশ্বতী প্রিন্টার্স
১৫/১সি, ডিক্‌সন্ লেন,
কলকাতা-৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ :
প্রেমকিশোর ঘোষ

ছবি :
মনোজিৎ চন্দ

দশ টাকা

উৎসর্গ

আমার মা ও বাবাকে

—শ্যামসুন্দর

ভূমিকা

খেলার নেশা ছিল। ক্রিকেটেই বেশি। অল্পসল্প ক্রিকেট খেলেছিও। ছাত্র জীবনে এবং ক্লাব পর্যায়ে। তার পর এক সময় শুরু হয়ে গেল ক্রীড়া সাংবাদিকের জীবন। খেলতে খেলতে যাদের কথা বেশি করে শুনেছি, শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং পরবর্তী সময়ে যাদের সঙ্গে কিছু ক্রিকেট খেলেছিও সেই সব বাঙালী টেস্ট ক্রিকেটারদের বিষয়ে লেখবার আমার এই প্রথম চেষ্টা।

এ বই লিখতে আমাকে প্রতিনিয়ত তাগিদ দিয়েছে আমার ভ্রাতৃসম সুহৃদ আশিস দত্ত। তাকে এবং যাদের কাছ থেকে আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই।

কালী পূজা

২রা কাতিক, ১৩৮৬

শ্যামসুন্দর ঘোষ

প্রথম বাঙ্গালী খোকন সেন

বাংলার মাটি নাকি টেস্ট ক্রিকেটারদের পক্ষে উর্বর নয়। এই অনুর্বর জমিতে ব্যাটে-বলে সাড়া জাগিয়েও যাঁরা টেস্ট অঙ্গনে ডাক পান নি সেই কার্তিক বসু, কমল ভট্টাচার্য, নির্মল চ্যাটার্জী প্রমুখ ক্রিকেটারদের কথা বাদ দিয়েও সাতজন বাঙ্গালী টেস্ট ক্রিকেটারের বিষয় লিখতে আগ্রহী হয়েছি এই জন্য যে, ভারতীয় ক্রিকেটের পঙ্কিল আবর্তের মধ্যেও ওদের মুখগুলিই বেশী ভেসে উঠেছে। শুরু করছি প্রথম বাঙ্গালীকে নিয়ে, যিনি তাঁর স্মৃতি রেখে সরে গিয়েছেন এই পৃথিবী থেকে।

● ● ●

ব্যাট হাতে ক্রিকেটের প্রাণপুরুষ ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। দস্তানা হাতে বছর একুশের ফুটফুটে একটি বাঙ্গালী ছেলে। অস্ট্রেলিয়া সফরে ছেলেটি প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েছেন। সকাল থেকেই ছেলেটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই খেলায় এমন কিছু কৃতিত্ব তাঁকে দেখাতেই হবে

যাতে দুই নম্বরের জায়গায় এক নম্বরে তাঁর স্থান মেলে। কিন্তু ক্রিজ জুড়ে ব্র্যাডম্যান যেভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাতে কৃতিত্ব দূরের কথা উইকেটরক্ষক হিসেবে বল ধরারই সুযোগ পাচ্ছেন না। প্রথম ইনিংসে ব্র্যাডম্যান করেছিলেন ১৫৬। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে যেভাবে ব্যাট করছেন তাতে ছেলেটি বুঝেছেন ব্র্যাডম্যানই তাঁর ক্রিকেট জীবনের প্রধান বাধা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্র্যাডম্যানই ছেলেটিকে টেস্ট খেলার সুযোগ করে দিলেন। মানকড়ের ফ্লাইট করা বল মারতে গিয়ে উইকেট থেকে সামান্য এগিয়ে এসেছিলেন। আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন অপেক্ষামান সেই বাঙ্গালী যুবক যার নাম খোকন সেন, পোশাকী নাম প্রবীর সেন।

খোকন সেনের টেস্টে প্রবেশের পথে ব্র্যাডম্যানের ঐ ষ্ট্যাম্প আউট ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্র্যাডম্যান আউট হয়ে তাঁবুতে ফিরে এসে ছেলেটির সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে অষ্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলের মধ্যে খোকন সেনই ছিলেন একমাত্র বাঙ্গালী খেলোয়াড়। দলের দুনম্বর উইকেটরক্ষক। খোকন সেনের আগে আরো একজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় দু'বার ভারতীয় দলের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড সফর করলেও একটি টেস্ট খেলার সুযোগ পান নি। তাই অষ্ট্রেলিয়া সফরে খোকন সেনের নাম যখন ঘোষনা করা হলো তখন এরাজ্যের অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন খোকনের ভাগ্য অনেকটা সুটে ব্যানার্জীর মতো হবে। কারণ দলের এক নম্বর উইকেটরক্ষক হচ্ছে ইরানী। আর দ্বিতীয়তঃ অষ্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে নতুন কোন খেলোয়াড়কে সুযোগ দেওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অঘটন ঘটলো। খোকন সেনই পাঁচটির মধ্যে তিনটি টেস্ট খেললেন। আর তার মূলে রয়েছে ব্র্যাডম্যানকে স্টাম্প আউট করার ঐ ঘটনা।

অষ্ট্রেলিয়া সফরে ওটা ছিল ভারতীয় দলের দ্বিতীয় খেলা। প্রতিপক্ষ

হচ্ছে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া। যার অধিনায়ক স্বয়ং ব্র্যাডম্যান। ইরানীর বদলে খোকন সেনকে ঐ খেলায় দলভুক্ত করা হয়। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে রান ৮ উইকেটে ৫১৮। ব্র্যাডম্যান একাই করলেন ১৫৬। প্রত্যুত্তরে ভারত করলো ৪৫১ রান। অধিনায়ক অমরনাথ করলেন ১৪৪, হাজারে ৯৫, মানকড় ৫৭। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২১৯ করে ব্র্যাডম্যান দলের ইনিংস ঘোষণা করলেন। ভারত শেষ পর্যন্ত করেছিল ৫ উইকেটে ২৩৫। মানকড় অপরাজিত ১১৬ ও অমরনাথ অপরাজিত ৯৪। ভারত ঐ খেলায় জিততে না পারলেও ঐ খেলায় ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। পরের খেলায় লালা অমরনাথ ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে করেন ২২৮ রান।

খোকন সেনের কথা লিখতে বসলেই মনে পড়ে তার জীবনের শেষ খেলার কথা। ১৯৭০ সালের ২৬ জানুয়ারী খোকন সেন এক প্রদর্শনী খেলায় অংশ নিয়েছিলেন কালীঘাট মাঠে। কালীঘাট ক্লাবের সঙ্গে খোকন সেনের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। খোকন সেনের বাবা অমিয় সেন ছিলেন ক্লাবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ক্লাব চালানোর প্রচুর অর্থ তিনি জুগিয়েছেন। ছেলেদের ফাই ফরমাস খাটার জন্য প্রত্যেকের জন্য এক একটি লোক বরাদ্দ থাকতো। আর প্রত্যেক বেয়ারার বুকে আঁটা থাকতো তার মনিবের নাম। খোকন সেনের গুনছিল অতি সহজেই অপরিচিতদের আপন করে নেওয়ার। ছাব্বিশে জানুয়ারী সারাদিন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হই-হুলোড় করেছিলেন। পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে। খোকন সেনের জন্ম ১৯২৬ সালের ৩১ মে। মৃত্যু ১৯৭০ সালের ২৭শে জানুয়ারী।

খোকন সেন সর্বসমেত ১৪টি টেস্ট খেলেছেন। পঙ্কজ রায় ছাড়া আর কোন বাঙ্গালী এতগুলি টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। টেস্ট ক্রিকেটে প্রবেশ ১৯৪৮ সালের পয়লা জানুয়ারী। জীবনের শেষ টেস্ট

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালে কলকাতার ইডেনে। এর পরে অবশ্য ১৯৫৩ সালে তৃতীয় কমনওয়েলথ একাদশের বিরুদ্ধে একটি বেসরকারী টেস্ট খেলায় অংশ নেন। রণজি ট্রফিতে ধারাবাহিকভাবে ভালো রান করলেও টেস্ট ক্রিকেটে খোকন সেন বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। টেস্ট ক্রিকেটে সর্বসমেত রান করেছেন ১৫৬। ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ হলেও উইকেট রক্ষক হিসাবে মোটামুটিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। সর্বসমেত ৩১ জন খেলোয়াড়কে তাঁবুতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে ক্যাচ ধরেছেন ২০টি, স্টাম্প করেছেন ১১টি।

আগে কিভাবে তিনি ভারতীয় টেস্ট দলে স্থান লাভ করলেন সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করি। উনিশশো সাতচল্লিশ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে এরাজ্য থেকে সম্ভাব্য খেলোয়াড় হিসেবে যার নাম বিশেষ উচ্চারিত হয়েছিল তিনি হলেন সুটে ব্যানার্জী। সুটে ব্যানার্জী তখন অল রাউণ্ডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। দু-দুবার বিদেশ সফর ছাড়াও তিনি ভারতীয় মাটিতে পাঁচটি বেসরকারী টেস্ট খেলায়ও অংশ নিয়েছিলেন। আর তাছাড়া টেস্ট দলে স্থানলাভের অন্যতম দাবীদার ফজল মামুদ অস্ট্রেলিয়া সফরে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সুটে ব্যানার্জীর পক্ষে ভারতীয় দলে স্থান লাভের স্বর্ণ সম্ভবনা মনে হয়েছিল। অমর সিং তখন মারা গিয়েছেন। খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন মহম্মদ নিসার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুটে ব্যানার্জীর দলে স্থান জুটলো না। তবে এরাজ্যের অধিবাসীরা লক্ষ্য করলেন টেস্ট দলে স্থান লাভের জন্য আর একজন দাবীদার হলেন প্রবীর সেন বা 'খোকন সেন।

খোকন সেনের টেস্টে প্রবেশ অবশ্য আদৌ অপ্রত্যাশিত ছিল না। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় দল যখন ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এলেন তখন এদেশের ক্রিকেট কর্মকর্তারা হিন্দেলকারের উত্তরসূরী খুঁজছিলেন। হিন্দলকার ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ দু-দুবার ইংল্যাণ্ড সফর করেছেন। ব্যাটস-মান ও উইকেটরক্ষক খোকন সেন তখন সম্ভবনাপূর্ণ খেলোয়াড়

১৯৪৬ সালেই খোকন সেনের ইংলণ্ডে যাওয়ার সম্ভবনা ছিল। কারণ ঐ সময় খোকন সেন ধারাবাহিকভাবে ভাল ব্যাটিং করছিলেন। মধ্য প্রদেশের (হোলকার) বিরুদ্ধে ১৯৪৪ সালে খোকন সেন করেন ১৪২ রান। আর ঐ বছর ওয়েণ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ষ্টেটসের বিরুদ্ধে রণজি ট্রফি ফাইনালে খোকন সেনের প্রথম ইনিংসের ৬১ রান তাঁর জীবনের স্মরনীয় ইনিংসের অন্যতম।

খোকন সেনের টেষ্টে প্রবেশ ঘটানোর মূলে রয়েছেন মনীন্দ্র দত্ত রায় (বেচুদা)। শুধু খোকন সেন কেন? টেষ্ট ক্রিকেটে যে কজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় দলভুক্ত হয়েছেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্বাচকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন এম দত্তরায়। খোকন সেনের টেষ্টে প্রবেশ সম্বন্ধে এম দত্ত রায়ের বক্তব্য 'অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দল গড়া হচ্ছে। নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান এইচ এন কন্ট্রাকটার। উইকেটরক্ষক হিসেবে খোকন সেনের সঙ্গে আর একজন খেলোয়াড়ের নাম উঠলো। দুজনেই দুটি করে ভোট পেয়েছেন। খোকনের প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়টির পক্ষে কন্ট্রাকটরের কাস্টিং ভোট দেওয়ার পালা। কিন্তু তার আগেই আমি সভা ত্যাগ করতে উদ্যত হলাম। কন্ট্রাকটরের প্রশ্নের উত্তরে জানালাম আপনি যখন একজনকে ভোট দিচ্ছেন কাষ্টিং ভোটও যে তাকে দেবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই সভায় উপস্থিত থেকে আর লাভ কি। এতেই কাজ হলো। খোকন সেনের পক্ষে কন্ট্রাকটরের কাস্টিং ভোট পড়লো।'

খোকন সেনের জীবনের প্রথম টেষ্ট খেলা ১৯৪৮ সালের পয়লা জানুয়ারী। প্রথম দুটি টেষ্টে ভারতীয় দলের উইকেট রক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন জে কে ইরানী। ব্রিসবেনে প্রথম টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া জয়লাভ করেছে ইনিংস এবং ২২৬ রানে, সিডনিতে বৃষ্টি বিঘ্নিত দ্বিতীয় টেষ্ট শেষ হয়েছে অমীমাংসিত ভাবে। দ্বিতীয় টেষ্টে ফাদকর ও হাজারের প্রশংসনীয় বোলিংয়ের ফলে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র

১০৭ রানে। তৃতীয় টেস্টে ভারত যে নব উদ্যমে খেলতে নামবে এটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বাদ পড়লেন কিষেণচাঁদ, আমির ইলাহী ও জে কে ইরানী। এদের বদলে এলেন রায় সিং, রংনেকার ও খোকন সেন। এদের মধ্যে রংনেকার প্রথম টেস্টে খেলেছিলেন। প্রথম ইনিংসে রান করেছিলেন এক, দ্বিতীয় ইনিংসে কোন রান করতে পারেন নি। রংনেকার টেস্ট খেলেছেন মোট তিনটি আর তা ঐ অস্ট্রেলিয়া সফরেই। পাঞ্জাবের রায় সিংহের প্রথম ও শেষ টেস্ট ঐ মেলবোর্ণ মাঠেই। আর ঐ মেলবোর্ণ মাঠেই খোকন সেনের টেস্ট জীবনের গোড়াপত্তন। শুধু যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনি তিনটি টেস্ট খেললেন তা নয়, ১৯৪৮ সালে ভারতের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই তিনি দলে স্থান পেয়েছিলেন। অস্টেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টে পাঁচটি ইনিংসে তার রান সংখ্যা ছিল ২৯। মেলবোর্ণের তৃতীয় টেস্টে রান করেছিলেন চার ও দুই, এডিলেডে দুটি টেস্টের প্রথম ইনিংসে কোন রান করতে পারেন নি। দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য রানে অপরাজিত থাকেন। মেলবোর্ণে পঞ্চম টেস্টে রান করেছিলেন ১৩ ও ১০। অস্টেলিয়া সফরে খোকন সেন যে তিনটি টেস্ট খেলেছেন তার দুটিতে ভারত পরাজিত হয়েছে ইনিংসে আর তৃতীয় টেস্টে অস্টেলিয়া জিতেছে ২৩৩ রানে।

অস্ট্রেলিয়া বা তার পরবর্তী সফরে খোকন সেন রান করতে না পারলেও উইকেটরক্ষক হিসাবে কিন্তু সুনাম কুড়িয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষ টেস্ট ম্যাচ খোকন সেনের টেস্ট জীবনে স্মরণীয় ঘটনা। ঐ খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে রান দাঁড়ায় ৮ উইকেটে ৫৭৫, খোকন সেন মাত্র একবারই বাই দিয়েছেন। সারা ইনিংসে রান দিয়েছেন মাত্র চারটি। ক্যাচ ধরেছেন চারটি—মিলার, হার্ভে, লক্সটন ও ট্যালোন। এছাড়া নবম উইকেট জুটিতে ফাদকারের সঙ্গে তিনি ৪৫ রান যোগ করেছিলেন যা ঐ সফরে রেকর্ড হিসেবে চিহ্নিত।

অস্ট্রেলিয়া থেকে খোকন সেন যখন ফিরে এলেন তখন ভারতীয় টেস্ট দলে এক নম্বর উইকেটরক্ষক হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ভারত সফরে এসেছে। প্রথম টেস্ট রাজধানী দিল্লীতে। উইকেটরক্ষক হিসেবে ডাক পড়লো খোকন সেনের। প্রথম টেস্টেই খোকন সেন তিনজন খেলোয়াড়কে ফিরিয়ে দিলেন। দুজন হলেন স্টাম্প আউট, ক্যাচ আউট হলেন একজন। খেলাটা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলেও দিল্লীর দর্শকরা কিন্তু আগন্তুক দলের মারমুখী ব্যাটিংয়ের আমেজ উপভোগ করেছিলেন। ভারতে আসার আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল স্বদেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছিল। দলে রয়েছেন ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান হেডলে, উইকস ও ওয়ালকটের মতো প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়েরা। দিল্লী টেস্টে রঙ্গচারী মাত্র ২৭ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম তিনজন খেলোয়াড়কে ফিরিয়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রান করে ৬৩১। এর মধ্যে চারজন শতরান করেন। ওয়ালকট (১৫২), গোমেজ (১০০), উইকস (১২৮), ও ক্রিশ্চিয়ানী (১০৭)। ভারত প্রত্যুত্তরে প্রথম ইনিংসে করে ৪৫৪ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ২২০। ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শক্তিশালী দল পাঁচটির মধ্যে মাত্র একটিতে জয়লাভ করে। চতুর্থ টেস্টে ভারত পরাজিত হয় ইনিংস ও ১৯৩ রানে। ঐ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একটি ইনিংসই ব্যাট করেছিল আর খোকন সেন ক্যাচ ধরেছিল তিনটি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ভারত কিন্তু যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় দিয়েছিল, আর ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে ভারত একটি টেস্টে জয়লাভ করতে পারতো। বোম্বাইয়ে শেষ টেস্টে আম্পায়ার যোশী যখন খেলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন তখন ওভারের একটি বল বাকী ও হাতে দেড় মিনিট সময়। ভারতের হাতে ছিল দুটি উইকেট। জয়ের জন্য প্রয়োজন ছরান। ঐ সময় ব্যাট করছিলেন ফাদকর ও গোলাম আমেদ।

প্লাস্টার বাঁধা হাতে ব্যাট ও পায়ে প্যাড পরে বসে রয়েছেন খোকন সেন। ঐ টেস্টে আরো একজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় ছিলেন সুটে ব্যানার্জী। অবহেলিত ও উপেক্ষিত সুটে ব্যানার্জীর টেস্ট ক্রিকেটে খেলার সুযোগ মিলেছিল একবারই। সুটে ব্যানার্জীর বলে উইকসের ক্যাচ ধরতে গিয়ে খোকন সেন আহত হন আর উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বয়ং অধিনায়ক লালা অমরনাথ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টে খোকন সেন দলভুক্ত হলেও ১৯৫১-৫২ সিরিজে ভারত সফররত ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে তাকে কিন্তু দুটি টেস্টে দলভুক্ত করা হয়। কলকাতায় তৃতীয় টেস্টে ও মাদ্রাজের শেষ টেস্টে। মাদ্রাজের শেষ টেস্ট খোকন সেনের ক্রিকেট জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। শুধু খোকন কেন? ভারত যত দিন টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অংশ নেবে ততদিন এদেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা মাদ্রাজের ঐ টেস্ট বিশেষ ভাবে স্মরণ করবে। কারণ ১৯৩২ সালে ভারত টেস্ট ক্রিকেটে প্রবেশ করলেও ঐ ৫১-৫২ সিরিজে মাদ্রাজে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম টেস্ট জয়। ইংল্যাণ্ডের নাইজেল হাওয়ার্ডের নেতৃত্বাধিনে ঐ দল প্রথম তিনটি টেস্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ করলেও কানপুরে চতুর্থ টেস্টে জয়লাভ করে আট উইকেটে। তাই মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্ট ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে রাবার যাতে ইংল্যাণ্ডের হাতে না যায় তার জন্য পঞ্চম টেস্টে মুস্তাক আলিকে সর্বপ্রথম ঐ সিরিজে খেলতে ডাকা হয়। যোশীর বদলে খোকন সেন আবার দলভুক্ত হন। মাদ্রাজে ভারত জয়লাভ করে ইনিংস ও আট রানে। আর এই সাফল্যের মূলে রয়েছে মুখ্যতঃ ভিনু মানকড়ের কৃতিত্ব। মানকড় প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন ৫৫ রানে আট উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন ৪টি উইকেট। মাদ্রাজে এই টেস্ট জয়ে যদিও মানকড়ের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য তথাপি বলা চলে

এই টেস্ট জয়ে আর দুজন বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের অবদান অনেকখানি। পঙ্কজ রায় করেছিলেন ১১১, আর মানকড়ের প্রথম ইনিংসে আটটি উইকেটের মধ্যে চারটি উইকেট আসে খোকন সেনের স্টাম্পিংয়ের সূত্রে। দ্বিতীয় ইনিংসেও খোকন সেন প্রথম ইনিংসের মতো হিল্টনকে স্টাম্প আউট করে মানকড়কে আরো একটি উইকেট উপহার দেন। প্রথম ইনিংসে হিল্টন ছাড়া আর যে তিনজন খেলোয়াড়কে খোকন সেন স্টাম্প করেছিলেন তারা হলেন গ্রেভনি, ঐ খেলায় ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডোনাল্ডকার ও ব্রায়ান স্ট্যাথাম।

মাদ্রাজ টেস্টে অসামান্য দক্ষতা দেখানোর ফলেই খোকন সেন ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় দলে স্থান পান। কিন্তু প্রথম দুটি টেস্টে মাধব মন্ত্রী উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। লীডস ও লর্ডসের দুটি টেস্টে ভারত পরাজিত হয় শোচনীয় ভাবে। ম্যানচেস্টারে তৃতীয় টেস্টে খোকন সেনকে দলভুক্ত করা হয়। ইংল্যাণ্ড প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেটে ৩৪৭ রান করে ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। খোকন সেন বাই দিয়েছিলেন মাত্র চারটি। লেন হাটন পিটার মে ও লেকারের ক্যাচ ধরেন। কিন্তু এ টেস্টেও ভারত আরো ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। দুটি ইনিংসে সর্বসাকুল্যে করে মাত্র ৫৮ ও ৮২ রান। তৃতীয় টেস্টে দক্ষতা দেখানোর জন্য পরের টেস্টেও খোকন সেনকে দলে স্থান দেওয়া হয়। বৃষ্টি বিঘ্নিত এই টেস্টে ইংল্যাণ্ড করে ৬ উইকেটে ৩২৬ (ডিক্লেয়ার)। ভারত প্রথম ইনিংসে করে ৯৮।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে দিল্লীতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খোকন সেন দলভুক্ত হন। পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্টের প্রথম সাক্ষাৎকারে ভারত জয়লাভ করে ইনিংস ও ৭০ রানে। পাকিস্তানের সঙ্গে ঐ সাফল্যের মূলে ছিল বিজয় হাজারে (৭৬ রান) ও হেমু অধিকারীর ব্যাটিং (৮১ অপরাজিত) এবং স্পিন জুটি মানকড়

ও গোলাম আমেদের প্রশংসনীয় বোলিং, মাদ্রাজে ভারতের প্রথম টেস্ট জয়ে মানকড় পেয়েছিলেন ১০৮ রানে ১২টি উইকেট। আর দিল্লীতে ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট জয়ে মানকড় পেলেন ১৩টি উইকেট ১৩১ রানের বিনিময়ে। এই টেস্টে ভারত করেছিল ৩৭২ রান প্রত্যুত্তরে

খোকন সেনের হাতে স্টাম্প হয়ে যিনি খোকনের উইকেট কিপিংয়ের অসাধারণ প্রশংসা করেছিলেন, ক্রিকেটের সেই প্রবাদ পুরুষ ডন ব্র্যাডম্যান।

পাকিস্তানের দুই ইনিংসে রান দাঁড়িয়েছিল ১৫০ ও ১৫২। খোকন সেনের আক্রমনাত্মক ২৫ রান ভারতের রান বাড়াতে অনেকটা সাহায্য করে। ভারতের ৮ উইকেটে ২২৯ এই অবস্থায় দশ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে খোকন সেন খেলতে আসেন এবং হেমু অধিকারীর সহায়তায় যোগ করেন ৩৪ রান। তবে খেলাটিকে ভারতের অনুকূলে নিয়ে আসার মূলে রয়েছে অধিকারী ও গোলামের জুটিতে শেষ উইকেটে ১৩৯ রান।

পাকিস্তানের সঙ্গেই খোকন সেন তার জীবনের শেষ টেস্ট খেলেন। প্রথম টেস্ট খেলার পর তাকে পর পর তিনটি টেস্টে বসিয়ে রাখা হয়। ঐ সিরিজে শেষ টেস্টে খোকন সেন আবার দলভুক্ত হন। জীবনের শেষ টেস্টে তিনি রামচাঁদের বলে মামুদ হোসেনকে স্টাম্প আউট করেন। ব্যাটিংয়ে করেন ১৩ রান। এর পরে খোকন সেন অবশ্য একটি বেসরকারী টেস্টে খেলেছিলেন।

টেস্ট থেকে অবসর নিলেও খোকন সেন কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত বাংলার হয়ে রণজি ট্রফি খেলায় অংশ নিয়েছেন। রণজি ট্রফিতে তাঁর সর্বোচ্চ রান বিহারের বিরুদ্ধে ১৯৫০-৫১ সালে ১৬৮। ঐ খেলায় জ্যোতিষ মিত্রের সহায়তায় নবম উইকেটে যোগ করেছিলেন ২৩১ রান। জ্যোতিষ মিত্রের ঐটি ছিল জীবনের প্রথম রণজি ট্রফি খেলা। আর ঐ খেলায় করেছিলেন ১৩৬ রান। দুঃখের বিষয় দুজন খেলোয়াড়ই আজ পরলোকে। জ্যোতিষ মিত্র শুধু মোহন-বাগানের অন্যতম ক্রিকেট খেলোয়াড়ই ছিলেন না ক্রিকেট সম্পাদক হিসেবে তরুণ খেলোয়াড়দের কাছে ছিলেন অতি আপনজন। খোকন সেনের মতো জ্যোতিষ মিত্রও ছিলেন দিলদরিয়া লোক। মোহনবাগানে আমি যে বছর ক্রিকেট খেলি সে বছর প্রায় প্রতিদিন অনুশীলনের শেষে খেলোয়াড়দের কোন না কোন হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। মোহনবাগানে থাকাকালিন বালীগঞ্জ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে একটি

খেলার আমি দশটি উইকেট পেয়েছিলাম। খেলার শেষে জ্যোতিষদার উষ্ণ আলিঙ্গন ভোলবার নয়। শুধু আলিঙ্গনের মধ্যেই আন্তরিকতা সীমাবদ্ধ রাখেন নি, দলের সবাইকে তিনি পেটপুরে খাইয়েছিলেন। খোকন সেনের কথাতেই ফিরে আসি। রণজি ট্রফিতে তিনি ৫৯ ইনিংসে রান করেছেন ১৭৯৬। ব্যাটিং গড় ৩৩'৩৪। বিহার ছাড়া হোলকার ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধেও শতরান করেছিলেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে মাত্র ৯৫ মিনিটে তিনি উড়িষ্যার বিরুদ্ধে করেন ১২৭ রান। তাঁর স্মরণীয় ইনিংসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঐবছর হোলকারের বিরুদ্ধে ৭৯ রান এবং জীবনের শেষ রণজি ট্রফি খেলায় সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে মূল্যবান ৫৭ রান। তবে হোলকারের সঙ্গে খেলতে নামলে খোকন সেন বোধ হয় কোন ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হন। ১৯৪৩ সালে রণজি ট্রফির দ্বিতীয় খেলায় তিনি শতরান করেন। ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক হিসেবে খোকন সেন পরিচিত হলেও বোলার হিসেবে কিন্তু তিনি এমন এক নজীর সৃষ্টি করেছেন যা দীর্ঘদিন এদেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা স্মরণ করবেন। উড়িষ্যার বিরদ্ধে ১৯৫৪-৫৫ সালে তিনি পরপর তিন বলে রামশাস্ত্রী, টি শাস্ত্রী ও এন পাটিকে তাঁবুতে ফিরিয়ে দিয়ে হ্যাটট্রিক লাভের গৌরব অর্জন করেন। ভারতীয় ক্রিকেটে স্বীকৃত উইকেটরক্ষকের রণজি ট্রফিতে হ্যাটট্রিক লাভ এখন পর্যন্ত এটি নজীর হয়ে রয়েছে।

খোকন সেনের টেস্ট ক্রিকেট মাত্র ছ'বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন? খোকন সেনের সমসাময়িক খেলোয়াড় ফাদকরের কাছে প্রশ্নটি রেখেছিলাম। ফাদকরের মতে খোকন সেন নিঃসন্দেহে উঁচুদরের উইকেট রক্ষক, তবে টেস্ট ক্রিকেট দীর্ঘদীন ধরে খেলতে হলে যে একাগ্রতা ও নিজেকে আরো ভালভাবে তৈরী করার প্রচেষ্টা থাকা উচিত খোকন সেনের আচরণে তার প্রমাণ বিশেষ মিলতো না 'খোকন হৈ-হল্লোড় করতে ভালবাসতেন। তবে মাঠের মধ্যে সদা সর্তক দৃষ্টি

রাখতেন ব্যাটসম্যানের দিকে। খোকন সেন নিজের খেলোয়াড় জীবন নিয়ে কিন্তু খুশীই ছিলেন। খেলার মাঠে বা অন্য কোন স্থানে যখনই তাঁর খেলোয়াড় জীবন নিয়ে প্রশ্ন করেছি তখনই লক্ষ্য করেছি তাঁর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। 'দেখ খেলোয়াড় জীবনে যা আমার স্বপ্ন ছিল তা সফল হয়েছে। বরং বলতে পারি বাড়তি লাভ ভারতের প্রথম দুটি টেস্ট জয়ের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করার সৌভাগ্য আর পেয়েছি বিশ্ব ক্রিকেটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ব্র্যাডম্যানকে স্টাম্প আউট করতে।'

উপেক্ষিত ক্রিকেটার

টেস্ট ক্রিকেটে বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত ও উপেক্ষিত খেলোয়াড় হলেন সুটে ব্যানার্জী। শুধু বাঙ্গালী কেন? ভারতের টেস্ট ক্রিকেটে সুটে ব্যানার্জীর মত অন্য কোন খেলোয়াড়কে টেস্টে প্রবেশের জন্য এত দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের প্রথম প্রবেশ ১৯৩২ সালে লর্ডস টেস্টে। ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে ১৯৩২ সালেই ইংল্যাণ্ড সফরে সুটে ব্যানার্জী দলের অন্যতম খেলোয়াড় হতে পারতেন। দল গঠনের জন্য পাতিয়ালায় যে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা করা হয় তাতে সুটে ব্যানার্জী রান করেছিলেন অপরাজিত ৩৪। উইকেট পেয়েছিলেন দুটি। তার মধ্যে ছিল মূল্যবান পতৌদির নবাবের উইকেটটি। পতৌদির নবাব ১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে সম্মত হয়েও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান। ভারতের চেয়ে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে খেলতেই যে তিনি আগ্রহী ছিলেন তার প্রমাণ ১৯৩২-৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডের হয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে খেলতে যাওয়া। ঐ সফরে সিডনিতে জীবনের প্রথম টেস্টে তিনি করেছিলেন ১০২ রান। পরে ১৯৪৬ সালে এই পতৌদির নবাবের উপরই ভারতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। (পরবর্তীকালে এঁর পুত্র মনসুর আলি খাঁন ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন)।

১৯৩২ সালে সুটে ব্যানার্জী ইংল্যাণ্ড সফরে যেতে না পারলেও পরবর্তী দুটি ইংল্যাণ্ড সফরে তিনি দলভুক্ত হন। কিন্তু কি ১৯৩৬ কি ১৯৪৬ দুটি সিরিজে মোট ছটি টেস্টের একটিতেও সুটে ব্যানার্জীকে দলে স্থান দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালে বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে একটি টেস্টে স্থান

পান। সুটে ব্যানার্জী কত বড়ো বোলার ছিলেন ? ভারতীয় নির্বাচক-মণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাই প্রমাণ হয়েছে ১৯৩২ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সুটে ব্যানার্জী যে কোন ভারতীয় দলে স্থান লাভের যোগ্য। সরকারী টেস্ট থেকে সুটে ব্যানার্জীকে বাদ দেওয়া হলেও ঐ সময় বেসরকারী টেস্টে তাঁকে একাধিকবার দলভুক্ত করা হয়। বেসরকারী টেস্টে সুটে ব্যানার্জী খেলেছেন মোট পাঁচবার। ১৯৩৫ সালে জ্যাক রাইডারের দলের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট, ১৯৩৮ সালে লর্ড টেনিসনের বিরুদ্ধে চারটি টেস্টে মনোনিত হলেও একটি টেস্টে খেলেন নি। আর ১৯৪৫ সালে সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে একটি খেলায় অংশ নেন। সুটে ব্যানার্জী শুধু বোলারই ছিলেন না। অল রাউণ্ডার হিসেবে তিনি দলকে সব সময় সাহায্য করে গিয়েছেন। খেলার মাঠে ইউটিলিটি প্লেয়ার বলে একটি কথা আছে। সুটে ব্যানার্জী ছিলেন সেই জাতের খেলোয়াড় যার মাঠে উপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে দর্শকদের মনে করিয়ে দেয়। বোলিংয়ে কিছু করতে না পারলে ব্যাটিংয়ে হয়তো ভাল রান করলেন। আবার বলে-ব্যাটে ব্যর্থ হলে দর্শনীয় ক্যাচ ধরলেন কিংবা ভালো ফিল্ডিং করে প্রতিপক্ষের রান সংগ্রহে বাধার সৃষ্টি করলেন। সুটে ব্যানার্জীর এই গুণ শুধু ভারতীয় নির্বাচক-মণ্ডলী নয়, দলের অধিনায়কও জানতেন। আর সেই জন্য প্রয়োজনে দলের এক নম্বর থেকে ১১ নম্বর প্রতিটি স্থানেই তাঁকে ব্যাট করতে হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভালো ব্যাট করা সত্ত্বেও পরবর্তী খেলায় তাঁর স্থান মিলেছে আরো পেছনে। আজীবন সুটে ব্যানার্জী অত্যাচার সহ্য করে গিয়েছেন। জীবনে মাত্র একবারই তিনি অধিনায়কের ব্যাটিং অর্ডারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে সারের বিরুদ্ধে যখন তাকে এগারো নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে ব্যাট করতে পাঠানো হয়, আর অত্যাচারীর কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে বোধ হয় হাতের ব্যাটকেই হাতিয়ার হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন

তিনি। ওই খেলায় তিনি শুধু শতরানই করেন নি, দশ নম্বর খেলোয়াড় সারভাতের সঙ্গে জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড করার কৃতিত্বও অর্জ্জন করেন। ১৯৪৬ সালে ঐ সফরের আগে সুটে ব্যানার্জীর ক্রিকেট জীবনের প্রথম দিকের কথা কিছু উল্লেখ করা যাক।

সুটে ব্যানার্জীর জন্ম ১৯১৩ সালের ৩রা অক্টোবর। ছোটবেলায় দেশবন্ধু পার্কে ক্রিকেট খেলার হাতেখড়ি। পরে এরিয়ান্সে দুঃখীরাম-বাবুর সংস্পর্শে এসে ক্রিকেট খেলার প্রতি তাঁর আগ্রহ আরো বাড়ে। ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে সুটে ব্যানার্জী কলকাতা মাঠে ব্যাটে-বলে চমক জাগিয়ে তুলেছিলেন। মোহনবাগানের মতো শক্তিশালী দলের ইনিংস শেষ হয়েছে মাত্র ৭৫ রানে। সুটে ব্যানার্জী একাই দখল করেছেন ৫টি উইকেট, রান করেছেন অপরাজিত ৩৬। গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরী, টাউন, পার্শী ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ওই সময় সুটে ব্যানার্জী ধারাবাহিক ভাবে ভালো খেলে চলেছেন। কিন্তু ভালো খেলা সত্বেও ১৯৩২ সালে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড থেকে দল নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সংস্থার কাছে যখন খেলোয়াড়দের নাম চাওয়া হলো তখন বাংলা থেকে যে চারজন খেলোয়াড়ের নাম পাঠানো হয় তারমধ্যে সুটে ব্যানার্জীর নাম ছিল না। নাম ছিল তাঁদের যাঁরা হলেন স্পোর্টিং ইউনিয়নের কার্তিক বসু ও গণেশ বসু, বি এন রেলওয়ের ন্যাটা স্পিন বোলার সুইনি ও পার্শীর মিনু প্যাটেল। এরা প্রত্যেকেই তখন প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়। তবু এদের সঙ্গে সুটে ব্যানার্জীকেও যে দলে ডাকা উচিত ছিল সে সম্বন্ধে এরিয়ান্সের প্রফুল্ল মুখার্জী পাতিয়ালার মহারাজাকে জানালেন। সেই সঙ্গে এটাও লিখলেন সুটে শুধু কলকাতা মাঠে নয়, পাঞ্জাবের মাঠেও যে চমক জাগিয়েছে সেটা আশাকরি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হয়ে সুটে ব্যানার্জী পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে উইকেট পেয়েছিলেন মোট ১২টি। প্রথম ইনিংসে ৫১ রানে সাতটি, দ্বিতীয়

ইনিংসে ৪৫ রানে পাঁচটি। এখনকার মতো তখনকার দিনে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল না। যেমন ছিল না রণজি ট্রফি প্রতিযোগিতা। খেলোয়াড়দের গুণাগুণ বিচার করা হতো ইউরোপীয়ান, হিন্দু, মুসলীম ও পার্শীর মধ্যে চতুর্দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে। ১৯৩২ সালে বাংলা থেকে কোন খেলোয়াড়ই ভারতীয় দলে স্থান পান নি। নিসার ও অমর সিং ছাড়া দলের তৃতীয় বোলার হিসেবে দলভুক্ত হলেন জাহাঙ্গীর খাঁন। লাহোরে যে ট্রায়াল খেলার ব্যবস্থা হয় তাতে জাহাঙ্গীর খাঁন করেছিলেন ১৯ রান। টেস্ট ক্রিকেটে জাহাঙ্গীর খাঁন অবশ্য দলভুক্তির যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। প্রথম ইনিংসে কোন উইকেট না পেলেও ১৭ ওভারে রান দিয়েছিলেন মাত্র ২৬। দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন চারটি উইকেট ৬০ রানের বিনিময়ে।

১৯৩২ সালে সুটে ব্যানার্জীর দল থেকে বাদ অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে টেস্ট দল থেকে যাতে বাদ না পড়েন তার জন্য আরো কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। ভর্তি হন গোবর ঘোষের আখড়ায়। বুঝেছিলেন সিম বোলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আরো পরিশ্রমের প্রয়োজন। ১৯৩৩ সালে জার্ডিনের নেতৃত্বে ইংলণ্ড দল আসে ভারতে খেলতে। জার্ডিন তখন বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলকে পাঁচটির মধ্যে চারটি টেস্টে পরাজিত করেছে। জার্ডিন ছাড়া অবশ্য নামী খেলোয়াড়েরা কেউই ভারত সফরে আসেন নি। জার্ডিনের উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন ভেরীটি। জয়লাভ করে এই দল ৩৪টি খেলায় মাত্র একটিতে পরাজিত হয়। জয়লাভ করে ১৭টি খেলায়। সফরে দলের পক্ষে সবচেয়ে বেশী রান করেন স্বয়ং জার্ডিন (৮৯৫ রান)। সুটে ব্যানার্জীকে একটি টেস্টেও দলে স্থান দেওয়া হয় নি। কিন্তু বাংলা ও এ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান দলের সঙ্গে এম সি সি-র খেলায় তিনি খেলার সুযোগ পান। খেলার আগের দিন এরিয়ান্স

টেস্ট ক্রিকেটে সবকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন। লারউডকে দিয়ে তিনি "বডিলাইন" বোলিংয়ের প্রচলন করেন।

তাঁবুতে আলোচনা হচ্ছে কি ভাবে জার্ডিনের বেশী রানের ইনিংস আটকানো যায় হঠাৎ সুটে ব্যানার্জী বলে বসলেন 'আমি যদি ব্রাহ্মণ সন্তান হই তাহলে কালকের শুরুতেই জার্ডিনকে তাঁবুতে ফিরিয়ে দেব।' সুটে ব্যানার্জী কথা রেখেছিলেন, দিনের চতুর্থ বলেই সরাসরি বোল্ড আউট করেছিলেন জার্ডিনকে।

১৯৩৩ সালে কোন টেস্টে সুটে ব্যানার্জীকে ডাকা হয় নি। ১৯৩৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার রাইডারের দল যখন ভারতে বেসরকারী টেস্ট খেলতে এলো তখনও প্রথম দুটি টেস্টে সুটেকে দলের বাইরেই রাখা হয়। বাংলার কার্তিক বসু একটি টেস্টে খেলেন। কমল ভট্টাচার্য কলকাতা টেস্টে ছিলেন দলের দ্বাদশ খেলোয়াড়। প্রথম দুটি টেস্টেই ভারত পরাজিত হয়। বোম্বেতে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে নয় উইকেটে। কলকাতায় আট উইকেটে। প্রথম টেস্টে অধিনায়ক ছিলেন পাতিয়ালার যুবরাজ। দ্বিতীয় টেস্টে সি কে নাইডু। লাহোরে তৃতীয় টেস্টে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় ওয়াজির আলির উপর। এই টেস্টে সুটে ব্যানার্জী দলভুক্ত হন। ওয়াজির আলি অধিনায়ক হওয়ায় সি কে নাইডু ও তার অনুগত বেশ কিছু খেলোয়াড়েরা লাহোরের খেলায় অংশ নিলেন না। দলে ব্যাটসম্যানের চেয়ে বোলার হলো বেশী। দলের ব্যাটিংয়ে কে গোড়াপত্তন করতে যাবে? সুটে ব্যানার্জীর উপর দায়িত্ব দেওয়া হলো। দ্বিতীয় ইনিংসে সুটে ব্যানার্জীর আক্রমণাত্মক ৭০ রান ও অধিনায়ক ওয়াজিরের ৯২ রান ভারতকে জয়লাভে সাহায্য করে। ভারত প্রথম ইনিংসে করেছিল ১৪৯। এর মধ্যে ওয়াজির আলি একাই করেছিলেন ৭৭। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে রান উঠেছিল ১৬৬। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত করে ৩০১। প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া করে ২১৬ রান। মহম্মদ নিসার দুই ইনিংসে পেয়েছিলেন মোট আটটি উইকেট। আমির ইলাহী প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন তিনটি উইকেট। বাঁকা জিলানী দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন চারটি উইকেট।

লাহোরে তৃতীয় টেস্টে সুটে ব্যানার্জী ভাল ব্যাট করলেও চতুর্থ টেস্টে কিন্তু দলে স্থান পান নি। মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্টেও ভারত জয়লাভ করে ৩৩ রানে। সুটে ব্যানার্জী শুধু তৃতীয় টেস্টেই ভালো খেলেন নি,

সুটে ব্যানার্জী

তার আগে বাংলার হয়ে অষ্ট্রেলিয়ার এই দলের বিরুদ্ধে ৩৫ রানে ছটি উইকেট দখল করেছিলেন।

১৯৩৫ সালে সুটে ব্যানার্জীর এই ইনিংস কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতীয় দলে স্থান পাওয়াতে অনেকটা সাহায্য করেছে। তবে ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ড দলে স্থান পাওয়ার মূলে রয়েছে মহারাজা ভিজির অবদান। ১৯৩২ সালে ভিজি ভারতীয় দলে স্থান পেয়েও সফরে যান নি। কারণ তাঁকে দলে সহঃ অধিনায়কের পরে স্থান দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন পোর বন্দরের মহারাজা। সহঃ অধিনায়ক ছিলেন লিমডির যুবরাজ ঘনশ্যামজী। কিন্তু এঁরা কেহই টেস্টে খেলেন নি। অধিনায়ক মাত্র চারটি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাট করেছিলেন তিনটি ইনিংসে। তিন

ইনিংসে সংগৃহীত রান মাত্র দুই। টেস্টে তাঁর বদলে অধিনায়ক হয়েছিলেন সি কে নাইডু। ১৯৩৬ সালে দলের অধিনায়কের সুযোগ যাতে মেলে তার জন্য ভিজি দুবছর আগে থেকেই বিভিন্ন রাজ্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। ১৯৩৫ সালে চারটি টেস্টের মধ্যে শেষ দুটি টেস্টে ওয়াজির আলির নেতৃত্বে ভারত জয়লাভ করায় ধরে নেওয়া হয়েছিল ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে ওয়াজির আলির উপরই দলের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তাছাড়া ওয়াজির আলি ছিলেন দলের অপরিহার্য খেলোয়াড়। কিন্তু ওয়াজির আলি অধিনায়ক হলে সি কে নাইডু ও তাঁর দলীয় খেলোয়াড়েরা দলের সঙ্গে যাবেন না। দলের বিভেদের এই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করলেন ভিজি। তিনি একদিকে বিভিন্ন সংস্থার কাছে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন রাজ্যের মনোনীত খেলোয়াড়কে দলভূক্ত করার আর অপরদিকে দিল্লীতে 'উইলিংডন ট্রফি' নামে একটা টুর্ণামেন্ট চালু করলেন। শেষ পর্যন্ত ভিজিই হলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক, আর দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে উইলিংডন ট্রফিতে সুটে ব্যানার্জী ভালো বল করার সুবাদে ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড় হিসেবে মনোনীত হলেন।

নিসার ও অমর সিং ছাড়া দলে তৃতীয় সিম বোলার হিসেবে কাকে দলভুক্ত করা হবে এবিষয়ে ভিজি ছিলেন চিন্তিত। সুটে ভালো বল করায় অন্যতম আম্পায়ার বিল হিচ ভিজিকে অনুরোধ করেছিলেন সুটেকে দলে নেওয়ার জন্য। হিচকে ভিজি আমন্ত্রন জানিয়ে ছিলেন ঐ খেলায় আম্পায়ারিং করতে ও সেই সঙ্গে ভারতীয় দল গঠন নিয়ে তাঁর মতামত জানাতে। সুটে দলভুক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত হয়তো ভারতীয় দলের ব্লেজার গায়ে চড়ানোর সৌভাগ্য হতো না। কারণ সুটে ব্যানার্জী দলের সঙ্গে যেতে পারবেন না বলে কলকাতা থেকে ভি জির কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল কাকার

অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটেছে সুটে ব্যানার্জী ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন।

'রাত্রি তখন ১০টা। হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এলো। টেলিগ্রামটায় ভিজি লিখেছেন "কাকার মৃত্যু সংবাদ শুনে খুবই মর্মাহত। দ্বিতীয়বার চিন্তা করো দলের সঙ্গে যাবে কি না"। বাড়ীর সবাই স্তম্ভিত। কারণ কোন কাকা মারা গিয়েছেন বলে আমরা জানি না। অথচ ভি জির কাছে সংবাদ গেল। বাবা বললেন কাল সকালেই ভি জির কাছে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে খবরটা মিথ্যা। আমি ভাবছি সুযোগ পেয়েও শেষ পর্যন্ত যেতে পারবো না, কারণ একে অধিনায়ক নিয়ে দলের মধ্যে অসন্তোষ। তার উপর হয়তো আমার বদলে অন্য কোন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হবে। তখন পঙ্কজ গুপ্ত স্পোর্টিং ইউনিয়নের কর্তাব্যক্তি। শুনেছিলাম কার্তিক দলে স্থান পাবেন। কিন্তু কার্তিক দলে নেই। কার্তিক দলে স্থান পান সেটা আমি চাই। ও তার আগে একটি বেসরকারী টেস্টেও খেলেছেন। শুয়ে শুয়ে মাথায় এইসব চিন্তা ঘুরছে। এমন সময় পাড়ার নামজাদা এটর্নী মিত্তিরদা এসে হাজির। রাত্রি তখন এগারটা। উনি এসেই বললেন ভিজি ওনার ওখানে ফোন করেছিলেন। কাকার মৃত্যুর জন্য সুটে দলের সঙ্গে যেতে পারবে না বলে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে সে সম্বন্ধে ভিজি সুটেকে আবার চিন্তা করতে বলেছেন। ভিজি ফোনের কাছে রাত্রি একটা পর্যন্ত বসে থাকবেন। আমি ও'র এটর্নী, তাই আমাকে এখনই সংবাদটা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। বাবা মিত্তিরদাকে জানালেন সংবাদটা সম্পূর্ণ অসত্য। আমাদের কোন আত্মীয়ই এখন মারা যান নি। সুটের নামে ভিজিকে যে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল সেটা অন্য কোন স্বার্থান্বেসী লোক পাঠিয়েছে।" শেষ পর্যন্ত সুটে জাহাজে চড়লেন। কিন্তু যাওয়ার পথে বাঁধাই হয়তো তাকে ইংল্যাণ্ডে টেস্ট খেলা থেকে বঞ্চিত করছে। নাহলে প্রথম দুটি টেস্টে বারোজন

খেলোয়াড়ের মধ্যে স্থান পেয়েও শেষ পর্যন্ত কোন টেস্টেই তাঁর খেলার সুযোগ ঘটলো না কেন? লর্ডসে প্রথম টেস্ট খেলার আগের দিন যখন ১২ জন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয় তখন দলে স্থান পাওয়ার ব্যাপারে সুটে ব্যানার্জী নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু খেলার দিন সকালে যখন নির্বাচিত ১২ জনের অন্যতম খেলোয়াড় এল পি জয় অধিনায়ককে জানালেন শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর পক্ষে মাঠে নামা সম্ভব নয় তখন ধরেই নেওয়া হয়েছিল দলের অপর এগারো জন খেলোয়াড়ই মাঠে নামবেন। সুটে ব্যানার্জী অবশ্য মাঠে নেমে-ছিলেন তবে দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে। জয়ের শূন্যস্থানে খেলতে আসেন পি এফ পালিয়া। পালিয়ার দলে স্থান পাওয়ার কারণ তিনি ছিলেন মহারাজের বেতনভূক কর্মচারী। ঐ খেলায় ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করে নয় উইকেটে। দলের ম্যানেজার ব্রিটন জোন্স অবশ্য এর প্রতিবাদ করেছিলেন। ওর বক্তব্য প্রথম যে ১২জন খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে ১১ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত করা উচিত। পালিয়া অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবেই দলে আসতে পারেন। পালিয়া ন্যাটা ব্যাটসম্যান ও ন্যাটা বোলার। সুটে ব্যানার্জীর তুলনায় অল-রাউণ্ডার হিসেবে তাকে দলে স্থান দেওয়া হলেও ১৯৩৬ সালে প্রথম টেস্টে কোন ইনিংসেই পালিয়াকে বল করতে দেওয়া হয়নি। ব্যাটে করেছিলেন ১১ ও ১৬ রান। ১৯৩২ সালেও পালিয়া টেস্টে স্থান পেয়েছিলেন। পালিয়া জীবনে দুটি টেস্টেই খেলেছেন। দুটি টেস্টে কোন উইকেট পাননি। প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে বল করেছিলেন চার ওভার, দ্বিতীয় ইনিংসে তিন ওভার। প্রথম টেস্টের উভয় ইনিংসে করেছিলেন একটি করে রান, তবে প্রথম ইনিংসে আউট হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ছিলেন অপরাজিত।

প্রথম টেস্টে দল থেকে বাদ পড়লেও ম্যাঞ্চেস্টারে দ্বিতীয় টেস্টে সুটে ব্যানার্জী দলভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিত ছিলেন। কারণ

একদিকে প্যালিয়া ব্যর্থ ও অপরদিকে জয় অসুস্থ। তাছাড়া এম, সি, সির মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে সুটে ব্যানার্জী চারটি উইকেট পেয়েছিলেন। রান করেছিলেন অপরাজিত ৪৫। কিন্তু টেস্টের আগের দিন ঘটনাচক্রে সুটে ব্যানার্জী ঘরোয়া কোন্দলের স্বীকার হলেন। সুটে ব্যানার্জীর কথাতেই ঘটনাটির উল্লেখ করি। "ম্যাঞ্চেস্টারে ২৫ শে জুলাই থেকে দ্বিতীয় টেস্টে খেলা। খেলার দুদিন আগে আমরা ঐ স্থানে হাজির। ওখানে এক বাঙ্গালী দম্পতির সঙ্গে অনুশীলনের সময় ছাড়া সারাক্ষণই কাটাচ্ছি। খেলোয়াড়দের মধ্যে কি রাজনীতি চলছে সে সম্বন্ধে কিছুই জানি না! ২৪শে জুলাই ভোরের দিকে হঠাৎ দরজায় আঘাত। দলের দুনম্বর উইকেটরক্ষক কে জি মেহেরহোমজি কিছুটা উত্তেজিত। ওর স্বভাবই তাই। আমাকে দেখেই বললেন "সুটে কোথায় তুমি ছিলে? তোমায় বিজয় খুঁজছে। আমরা সবাই ঠিক করেছি ভিজিকে বলবো দ্বিতীয় টেস্টে তিনি যাতে না খেলেন। অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হোক সি কে নাইডুকে। মুস্তাক, সি. এস নাইডু মার্চেন্ট ও আরো অনেকে স্থির করেছেন ভিজির কাছে লিখিত একটা প্রস্তাব দেবে।" মেহেরহোমজিকে বললাম ঠিক আছে একটু বাদে আমি খেলোয়াড়দের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি। স্প্রিং গদিতে আমার এমনই ঘুম হয় না। তাও ভোরের দিকে যখন ঘুম এলো তখনই মেহেরহোমজি আমার ঘুমের বারোটা বাজালো। কিন্তু এই রাজনীতির মধ্যে আমি কি করবো। বিজয় আমার বন্ধু। বোম্বেতে খেলতে এলেই আমি বিজয়ের বাড়ীতে উঠি। কথাটা সবার জানা। ওদিকে ভিজি আমাকে ভালবাসেন। ভিজি কিভাবে অধিনায়ক হয়েছেন সেটা আমার জানা। আর তাছাড়া এই রাজনীতির মধ্যে আমি কেন নিজেকে জড়াব? সি কে নাইডু ও ওয়াজির আলিকে টপকে ভিজি যখন অধিনায়ক হয়েছেন তখন এদের কথায় ভিজি আদৌ অধিনায়কের দায়িত্ব ছাড়বেন না বলে আমার বিশ্বাস। তাছাড়া ঐদিনই কলকাতায় থেকে বাবার চিঠি এসেছে। উনি শুনেছেন

দলে রাজনীতি হচ্ছে। আমাকে এসবের থেকে দূরে থাকতে আদেশ দিয়েছেন। দলের খেলোয়াড়দের এড়িয়ে যাওয়া স্থির করলাম। কিন্তু সেটাই হলো আমার বোকামি বা গ্রহের ফের। ভিজির ধারণা হলো তাঁকে অধিনায়ক থেকে সরাবার ব্যাপারে আগ্রহী। আর দ্বিতীয় টেস্টে তাই আমাকে দ্বাদশ খেলোয়াড় নির্বাচিত করলেন। পরে সাক্ষাৎকারে আমাকে উনি শুনিয়েও দিলেন খেলোয়াড়দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর অধিনায়কের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে না। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম আমি এসবের মধ্যে নেই। কিন্তু যারা ওর চারপাশে ছিলেন তারা বুঝিয়েছিলেন বিজয় যেহেতু আমার বন্ধু। তাই বিজয়ের ইচ্ছেই প্রকারন্তে আমার ইচ্ছা।" ভিজিকে খেলোয়াড়েরা যখন অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবার প্রস্তাব দিল তখন উনি খেলোয়াড়দের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন "আমাকে পোর বন্দরের মহারাজা পাওনি। আমি প্রতিটি টেস্টে খেলবো। যাদের খেলার ইচ্ছে নেই তাদের আমি দেশে পাঠিয়ে দেব।" ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে সুটে ব্যানার্জীর স্থানে দলভুক্ত হল সি রামস্বামী। প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৪০ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ রান। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে দুই সূচনাকারী ব্যাটসম্যান মার্চেন্ট ও মুস্তাক শতরান করেছিলেন। আর তিন টেস্ট সিরিজের ঐ একটি খেলাই শেষ হয়েছিল অমীমাংসিত ভাবে। তৃতীয় টেস্টে দ্বাদশ খেলোয়াড় নির্বাচন করার আগেই সুটে ব্যানার্জী অধিনায়ক ভিজিকে অনুরোধ জানালেন এই টেস্টে অন্ততঃ ঐ দায়িত্ব থেকে তাকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। কারণ দ্বাদশ খেলোয়াড় থাকলে খেলাটি উপভোগ করার সুযোগ খুব কমই থাকে। সুটে ব্যানার্জী জানাতেন ভিজি কান পাতলা। তাই একবার যখন তাঁকে বোঝানো হয়েছে সুটে তার বিপক্ষে তখন হাজার চেষ্টা করেও তার মন থেকে কথাটা মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

উনিশশো ছত্রিশ সালের মতো ১৯৪৬ সালেও সুটে ব্যানার্জী রাজ-

নীতির বলি হলেন। তবে এবারের ঘটনা অন্যরূপ। সফরের প্রথম খেলা উস্টারশয়ারের বিরুদ্ধে। ভারতীয় দলের অবস্থা এক সময় এমন এক জায়গায় এসে দাড়ালো যাতে এ খেলায় জয়লাভ করা খুবই অসম্ভব। অধিনায়ক পতৌদি খেলোয়াড়দের নির্দেশ দিলেন তাড়াতাড়ি আউট হয়ে চলে এসো। কারণ পরের খেলা অক্সফোর্ডের সঙ্গে। দলের ইনিংস তাড়াতাড়ি শেষ হলে অধিনায়ক পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে পারবেন। সুটে ব্যানার্জী ১০ নম্বর ব্যাটসম্যান। প্যাড পরে সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করছেন। ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্ত অধিনায়কের নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসের ব্যবস্থা করতে ছুটলেন। যদিও সন্ধ্যেবেলায় খেলার শেষে রওনা হওয়ার জন্য আগের থেকে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আগাম টাকাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পতৌদি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজী নয়। খেলোয়াড়েরা জিনিষপত্র গোছাচ্ছে এমন সময় ভারতীয় দলের অষ্টম খেলোয়াড় আউট হলেন। সুটে ব্যানার্জী ব্যাট করতে নামছেন পেছন থেকে পতৌদি নির্দেশ দিলেন তাড়াতাড়ি চলে এসো। প্রতিপক্ষ দলের রান থেকে ভারতীয় দল তখনও ১৪৬ রানে পিছিয়ে। সুটে ব্যানার্জী প্রতিজ্ঞা করলেন অসম্ভবকে সম্ভব করবো। ছোটবেলা থেকেই তিনি এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। অসম্ভব বলে ক্রিকেটে কোন শব্দ নেই। সুটে ব্যানার্জী এসেই দুটি চমৎকার ড্রাইভ করলেন। আর তখনই তিনি বুঝলেন আজ এই মাঠে তিনি অঘটনই ঘটাবেন। অপরপ্রান্তে রুসী মোদী। দুজনেই চমৎকার খেলে চলেছেন। হঠাৎ মাঠ থেকে লক্ষ্য করলেন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা অধিনায়কের পেছন পেছন মাঠ থেকে চলে যাচ্ছেন। একবার ভাবলেন আউট হয়ে যান। পরক্ষণেই তার বিদ্রোহী মন প্রতিবাদ করে উঠলো। এই ভাবে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। আর তাছাড়া তিনি তো কোন অন্যায় করেন নি। তবে ? ভারতীয় খেলোয়াড়েরা মাঠ ত্যাগ করলেও সুটে ও রুসি মোদী ওই খেলায় দারুণ খেললেন।

মোদী রান করেছিলেন ৮০-র ওপর, সুটে ৫২। ভারত অসম্ভবকে প্রায় সম্ভবই করতে চলেছিল। মাত্র ১৪ রানের জন্য ভারত পরাজিত হয়। খেলার মাঠে এই সংগ্রামের জন্য সহঃ খেলোয়াড়েরা তারিফ না জানালেও (খেলোয়াড়েরা তখন তো অক্সফোর্ডের পথে) মাঠে উপস্থিত ইংরেজ দর্শকরা এই খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। খেলার শেষে মোদী, সুটে ব্যানার্জী, পঙ্কজ গুপ্ত ও এগারো নম্বর খেলোয়াড় সিন্ধে আগের ভাড়া করা ৩২ জন বসার বাসটি নিয়ে অক্সফোর্ডের পথে রওনা হলেন।

সুটে ব্যানার্জীর এই খেলায় প্রশংসা তো দূরের কথা পতৌদি যে কত পরিমাণ ক্ষুন্ন হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে পরবর্তী খেলাগুলিতে। পরের খেলায় পতৌদির নির্দেশে আব্দুল হাফিজ কারদার এমন এক ঘটনা ঘটালেন যাতে শুধু সুটে বিস্মিতই হন নি কল্পনাতেও ভাবতে পারেন নি কোন ক্রিকেটার এমন আচরণ করতে পারে। আগের খেলায় ভালো ব্যাট করার জন্য সুটেকে উপরের দিকে ব্যাট করতে পাঠানো হয়েছে। সুটে ব্যানার্জী নেমেই কয়েকটি দর্শনীয় মার মারলেন। নিজের রান সংখ্যা যখন ২৭ সেই সময় মিড অফে বল ঠেলে রান নেওয়ার জন্য হাফিজকে আহবান জানালেন। কিন্তু হাফিজ শুধু নির্বাকই নন, অন্যদিকে মুখ ফিরে ক্রিজে দাঁড়িয়ে রইলেন। চীৎকার করে ডেকেও যখন হাফিজকে নড়ানো গেল না তখন সুটে আবার নিজের ক্রিজে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তাই হয়েছে। বল চলে এসেছে উইকেট রক্ষকের হাতে। এভাবে রান আউট হওয়া দুঃখজনক। তবু সুটে ভাবলেন হয়তো কারদার ওই বোলারের বিরুদ্ধে খেলতে চান নি। কিন্তু তাঁবুতে ফিরে যখন জনৈক সহকর্মীর কাছথেকে শুনলেন পতৌদির নির্দেশে তাকে এভাবে আউট করা হয়েছে তখনই বুঝতে পারলেন এই সফরেও তাকে দলে স্থান দেওয়া হবে না। তবু অন্যায়ের কাছে কিছুতেই নতি স্বীকার নয়। সুটে ব্যানার্জী

লিভারপুলে পরের খেলাতেই পেলেন ছটি উইকেট। তার পরের খেলা সারের বিরুদ্ধে। অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজয় মার্চেন্টের উপর। মার্চেন্টের ব্যাটিং অর্ডারে সুটে ব্যানার্জীর স্থান জুটলো এগারো নম্বর। এই প্রথম সুটে ব্যানার্জী প্রতিবাদ জানালেন। মার্চেন্টকে বললেন ভালো ব্যাট করার স্বীকৃতি এভাবে না জানালেও কি নয়? ব্যাট করতে নামার আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন সুটে, 'হে ভগবান আমার সহযোগী ব্যাটসম্যান যেন কিছুক্ষণ উইকেটে টিকে থাকেন।' নিজের উইকেটে টিকে থাকা সম্বন্ধে সুটের আত্মবিশ্বাস ছিল। সুটের ব্যাটিং সম্বন্ধে জনৈক ব্রিটিশ সাংবাদিক বলেছিলেন 'সুটে যেন কোন ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন।' শুধু সুটে নয়, বোধহয় দশ নম্বর খেলোয়াড় সারভাতেও ঐ একই শক্তির সাহায্যে ব্যাট করেছিলেন। তাই যা অকল্পনীয় তাই বাস্তবে সম্ভব হলো। শেষ উইকেট জুটিতে সারভাতে ও সুটে ব্যানার্জী যোগ করেন ২৪৮। সারভাতে করেন ১২৪, সুটে ব্যানার্জী ১২১। আজ পর্যন্ত অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর খেলায় দশ ও এগারো নম্বর ব্যাটসম্যান শতরান করেন নি। এর আগে প্রথম শ্রেণীর খেলায় নিউ সাউথ ওয়েলসের কিপাক্স (অপরাজিত ২৬০) ও হুকার (৬২) মেলবোর্ণের বিরুদ্ধে ১৯২৮-২৯ সালে ৩০৯ রান যোগ করে শেষ উইকেট জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড করেন। শেষ উইকেট জুটিতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড থেকে ভারতীয় জুটির রান দ্বিতীয় স্থানে হলেও শেষ দুই খেলোয়াড়ের শতরান লাভ বিশ্ব ক্রিকেটের নয়া নজীর। ঐ খেলায় সারের পক্ষে যারা বোলিং করেছিলেন তাদের মধ্যে বেডসার ভ্রাতৃদ্বয়, গোভার ও ফিসলক ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেষ্ট দলে স্থান পেয়েছিলেন।

যাদের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে সুটে সেঞ্চুরী করেছিলেন তারা ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেষ্টে স্থান পেলেও সুটে কিন্তু কোন টেষ্টেই দলভুক্ত হলেন না। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় দলের ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ১৪

জন খেলোয়াড় টেস্টে খেলেছিলেন। দলের দু'নম্বর উইকেটরক্ষক
নিম্বলকার আর সুটের টেস্ট দলে স্থান মেলেনি। নিম্বলকার আঙ্গুলে
আঘাত পাওয়ায় ঐ সফরের অনেক খেলায় খেলতে পারেন নি। এক
সময় দুই উইকেটরক্ষকই আহত হওয়ায় অমরনাথ, নাইডু অথবা গুল
মহম্মদকে উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব নিতে হয়। নিম্বলকার যদি
আহত না হতেন তাহলে হয়তো তাঁর পক্ষেও একটি টেস্ট খেলা
সম্ভব হতো। কিন্তু সুটে হাজার ভালো খেললেও তাঁর দলে স্থান
নেই। অধিনায়কের নির্দেশমতো আউট না হয়ে ব্যাট করাতো পতৌদির
চোখে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ব্যাপার। সারের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করার পর তাঁবুতে
ফিরে এলে বিজয় সুটের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। জানিয়েছিলেন
ঐ খেলার অধিনায়ক হয়েও পতৌদির নির্দেশে তাকে এগার নম্বরে ব্যাট
করতে পাঠানো হয়। দলের সহযোগী খেলোয়াড়েরা অধিনায়কের
প্রশংসায় সব সময় পঞ্চমুখ। কিন্তু এ খেলোয়াড়টি তা কেন করে না?
আসলে সুটে রাজা মহারাজাদের বরাবরই এড়িয়েই চলেন। তাঁর
বিশ্বাস খেলোয়াড়দের পরিচয় খেলার মাঠে। আর সুটের কাছে
পতৌদি খুব একটা বড় ক্রিকেটার নন। ১৯৪৬ সালে তিনটি টেস্টে
পতৌদির সর্বসকুল্যে রান মাত্র ৫৫।

উনিশশো ছেচল্লিশ সালে যেভাবে ভারতীয় দল গঠিত হয়েছিল সে
সম্বন্ধে প্রফেসর দেওধর তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে অধিনায়ক
পতৌদির সমালোচনা করেছিলেন। দেওধরের বক্তব্য ভারতীয় দলের
বোলিংয়ের পুরো দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় মানকড়ের উপর। অথচ
দলে এমন একজন খেলোয়াড়কে বসিয়ে রাখা হয় যিনি দলে স্থান
পাওয়ার যোগ্য। সুটে দলে স্থান না পাওয়ায় দেওধর লিখেছিলেন
'এটা দুঃখজনক ঘটনা যে আগের সফরের মতো এ সফরেও সুটে
ব্যানার্জীকে একটি টেস্টেও দলে স্থান দেওয়া হয় নি।' ১৯৪৬ সালে
নিসার ও অমর সিং দলে না থাকায় ধরেই নেওয়া হয়েছিল সুটে

ব্যানার্জী দলের আক্রমণ রচনা করবেন। কারণ যারা টেস্টে নতুন বলের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেই অমরনাথ, হাজারে ও সোহনীর চেয়ে সুটে ব্যানার্জীর বলের জোর ছিল অনেক বেশী। আর মাঝের সারির ব্যাটসম্যান হিসেবে সুটে যে দলকে মোটামুটি ভাল রানই উপহার দেয় ইংল্যাণ্ডের প্রথম শ্রেণীর খেলার ফলাফলই তার প্রমাণ।

ইংল্যাণ্ডে দু-দুটি সফরে সুটে ব্যানার্জীকে টেস্ট দলে স্থান না দেওয়ায় এদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে সমালোচনার ঝড় বয়েছিল তারই জন্য নির্বাচকমণ্ডলী পরবর্তী অস্ট্রেলিয়া সফরে তাকে আর দলভুক্ত করলেন না। সুটে ব্যানার্জী অবশ্য তাতে নিরুৎসাহ হলেন না। রণজি ট্রফিতে তিনি তখন ধারাবাহিকভাবে বিহারের পক্ষে খেলে চলেছেন। অবশেষে ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম ও শেষ টেস্টে তাকে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। তার আগে ঐ সিরিজে খোকন সেন ছাড়া আরো দুজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় টেস্টে খেলেছেন। তৃতীয় টেস্টে মন্টু ব্যানার্জী ও চতুর্থ টেস্টে পুঁটু চৌধুরী।

জীবনে একটি টেস্ট খেলার সুযোগেই সুটে ব্যানার্জী তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। ঐ টেস্টের প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন একটি উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪.৩ ওভার বল করে ৫৪ রানে পেয়েছিলেন চারটি উইকেট। বলতে গেলে চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিন জন খেলোয়াড়কে ফিরিয়ে দিয়ে ব্রাবোন স্টেডিয়ামে রীতিমতন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সুটে ব্যানার্জীর মারাত্মক বোলিংই দলকে জয়ের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো শক্তিশালী দল মাত্র ২৬৭ রানে আউট হয়ে যায়। পাঁচটি টেস্টের এটি হচ্ছে সবচেয়ে কম রানের ইনিংস। সুটে ব্যানার্জী প্রথম ইনিংসেও আরো বেশী উইকেট পেতেন যদি না উইকেটরক্ষক খোকন সেন উইকসের সহজ ক্যাচ মাটিতে ফেলে না দিতেন। তবু দীর্ঘ সংগ্রামের পর টেস্ট দলে স্থান পাওয়ার প্রথম

সুযোগ সুটে ব্যানার্জী যে এত মারাত্মক বোলিং করতে পারবেন তা বোধহয় নির্বাচকমণ্ডলীও স্বপ্নে ভাবতে পারেন নি। কারণ একদিকে সুটে ব্যানার্জীর বয়স হয়েছে। অপরদিকে ঐ বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল আগের টেস্টগুলিতে যে দাপটে ব্যাট করেছে তাতে তাদের কাছে আরো বেশী রানই প্রত্যাশা ছিল। উইকসের ব্যাটে রানের ফুলঝুরি ফুটছে। প্রথম তিনটি টেস্টে চার ইনিংস ব্যাট করার সুযোগে চারটি সেঞ্চুরী করেছেন। মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্টেও সেঞ্চুরী করতেন যদি না দুর্ভাগ্যবশত ৯০ রান করে রান আউটের কবলে না পড়তেন। পঞ্চম টেস্টের প্রথম ইনিংসে খোকন সেন যখন উইকসের ক্যাচ ফেলে দিলেন তখন উইকসের রান ২০-র কোঠায়ও পৌঁছয়নি। পাঁচটি টেস্টের সাতটি ইনিংসে উইকস সংগ্রহ করেছিলেন ৭৭৯ রান (ব্যাটিং গড় ১১১.২৮)। ব্যাটিংয়ে উইকস ছাড়া, ওয়ালকট, স্টলমেয়ার, রে, গোমেজ প্রত্যেকেই দাপট দেখিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই শক্তিশালী দলকে কিন্তু ভারতের মাটিতে একটি খেলাতেই হার স্বীকার করতে হয়েছে আর তা ঘটেছে পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে। ঐ খেলায় সুটে ব্যানার্জী পেয়েছিলেন ৬৭ রানে সাতটি উইকেট। সুটে ব্যানার্জী ঐ বছর রণজি ট্রফিতে বিহারের হয়ে দিল্লীর বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকও করেছিলেন।
বস্তুতঃ ঐ বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ভারত সফরের সিদ্ধান্ত যখন চূড়ান্ত হলো তখনই সুটে ব্যানার্জী স্থির করলেন তাকে টেস্টে খেলতেই হবে আর তার জন্য নিজেকে আরো প্রস্তুত করার দরকার। সুটে ব্যানার্জী তখন জামসেদপুরে কাজ করেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে যখন তার সংকল্পের কথা জানালেন তখন সুটের মতো অনেকেরই দ্বিধা ছিল, সময়ে যাকে টেস্টে খেলানো হয় নি সে কি এখন টেস্ট দলে স্থান পাবে। সুটে ব্যানার্জী বুঝেছিলেন আরো অনুশীলনের প্রয়োজন, আর সেই সঙ্গে দরকার ভালো ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বল করার। কর্তৃ-পক্ষের কাছে অনুরোধ জানালেন তাকে সাময়িকভাবে বোম্বেতে বদলী

করার। কর্তৃপক্ষ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। আর রণজী ট্রফি ও ওয়েষ্ট ইন্ডিজদের বিরুদ্ধে ভাল বল করার সুযোগে তিনি দলে নিজের স্থান করে নেন। ওয়েষ্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তার পাঁচটি উইকেট পাওয়াই বড়ো কথা নয়, লেংথ ও নিশানা লক্ষ্য করে তিনি যেভাবে বল করেছিলেন তা দীর্ঘদিন ব্রাবোন ষ্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের মনে থাকবে। ঐ খেলায় জয়ের দোরগোড়ায় এসেও ভারত মাত্র ছ'রানের জন্য জয়লাভে ব্যর্থ হলো।

ওয়েষ্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওটাই ছিল সুটের শেষ টেষ্ট খেলা। ঐ খেলায় ঐ সাফল্যের পরেও ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ কিন্তু সুটের দিকে ফিরেও তাকালো না। কিন্তু তাতে সুটের দুঃখ নেই। নিজের যোগ্যতায় একটি টেষ্ট তো খেলেছি। আর ভবিষ্যৎ ক্রিকেটারদের কাছে আদর্শ খেলোয়াড় হিসেবে যদি কিছু না রেখে যেতে পারতাম তাহলে কিসের ক্রিকেটার। সতের বছর সংগ্রামের পর টেষ্ট খেলার সুযোগ পাওয়া নিশ্চয়ই ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু পুরুষকার বলে একটা কথা আছে। নিজের যোগ্যতায় টেষ্ট দলে স্থান পাওয়া, আর সেই সঙ্গে সাফল্য লাভ করার মাঝে সাহসিকতার দিক দিয়ে যে আনন্দ আছে তা কে অস্বীকার করবে।

লবন হ্রদের ছোট্ট ফ্ল্যাটে বসে অবসর সময়ে সুটে ব্যানার্জী এখন বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পড়ে কাটান। মাঝে মধ্যে স্ত্রীকে বলেন খেলোয়াড় জীবনের 'পেপার' কাটিংগুলি এগিয়ে দিতে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চলে যান ১৯৩৬ সালে কিংবা ১৯৪৬ সালে। সেদিন মেহেরমজীর কথাটা ভিজ্জিকে আগাম জানিয়ে দিলে ভালো হতো না? ভিজ্জিকে জানিয়ে দিলে তার কৃপাপ্রার্থী লাভের সুযোগ ঘটতো! ১৯৪৬ সালে পতৌদির কথা রাখতে উরষ্টারশায়ারের বিরুদ্ধে আউট হয়ে এলেই হয়তো ভাল হতো। তাহলে পতৌদি খুশী হতেন আর টেষ্ট দলের স্থানও মিলতো। রাজনীতি থেকে শতহস্তে দূরে থাকার চেষ্টা

করলেও শেষ পর্যন্ত রাজনীতিরই স্বীকার হলেন। সুটে ব্যানার্জীর বিদ্রোহী মন বরাবরই সুবিধেবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠেছে। তাই কুচক্রী ও স্বার্থান্বেষীদের হাত থেকে নিজেকে শতহস্ত দূরে রাখার জন্য তিনি অন্য প্রদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন কলকাতা থেকে ১৯৩৬ সালে যখন ভিজির কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হলো তখনই বুঝেছিলেন আর নয়, কলকাতা ছেড়ে এমন জায়গায় যাবো যেখানে খেলা নিয়ে সময় কাটাবে। তাই ১৯৩৬ সালে চলে যান নওনগরে। যেখানে অমর সিং, ভিনু মানকড়, আব্দুল আজিজ, মোবারোক আলির সঙ্গে খেলার সুযোগ মিলেছে। ছ-বছর ওখানে কাজ করার পর চলে আসেন বিহারে। চাকুরী জীবনের শেষের দিকে কাজ করেন ভিলাইতে। নওনগর, জামসেদপুর, ভিলাই যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই পেয়েছেন সহকর্মীদের শুভেচ্ছা। সুটে ব্যানার্জী যা পেয়েছেন তাতেই আনন্দ। ভাবতে পারেন নি কলকাতার ক্রিকেট প্রেমিক তাকে এভাবে অর্থ সাহায্য করবে। সুটে ব্যানার্জীর বিশ্বাস অন্যায়ের কাছে আপোষ না করে তিনি ভালই করেছেন।

অবিচারের শিকার

মন্টু ব্যানার্জী

জীবনের প্রথম টেস্ট আবির্ভাবে প্রথম ওভারেই উইকেট লাভ যেকোন বোলারের পক্ষে কৃতিত্বের ব্যাপার। আর সেই উইকেট লাভের পেছনে যদি শুধু বোলারের একক নৈপুণ্যের নিদর্শন থাকে তাহলে তো কথাই নেই।

উনিশশো আটচল্লিশ সালে দুটি টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল যখন ৬০০-র উপর রান তুললো তখন কলকাতায় তৃতীয় টেস্টে মন্টু ব্যানার্জীকে দলভুক্ত করা হয়। মন্টু ব্যানার্জী শুধু প্রথম ওভারেই এ্যাটকিনসনকে বোল্ড আউট করেন নি, আধ ঘন্টার মধ্যে অপর

সূচনাকারী ব্যাটসম্যান এ এফ রেকে এল বি ডব্লিউ করেন। আর তারপর গোলাম আমেদের বলে ওয়ালকটকে মিড উইকেটে যেভাবে ক্যাচ ধরেছেন তা শুধু অকল্পনীয় নয়, অবিশ্বাস্য। প্রথম তিনটি উইকেট ফিরিয়ে দেওয়ার পেছনে খেলোয়াড়টির অসামান্য দক্ষতার জন্যই পর দিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ছেলেটির প্রশংসা করা হয়। আর সাংবাদিকদের স্বীকৃতির প্রতি সম্মান জানানোর জন্যই বোধ হয় দ্বিতীয় দিন খেলোয়াড়টি আরো দুটি উইকেট দখল করেন। জীবনের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে চারটি উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে একটি এবং প্রথম টেস্টে তিনটি ক্যাচ ধরা যে কোন্ বোলারের পক্ষে অসামান্য সাফল্য হলেও ভারতীয় ক্রিকেট কর্মকর্তাদের কাছে এটা আদৌ দক্ষতা নয়। তাই মন্টু ব্যানার্জীকে একটি খেলার মধ্যেই তাঁর টেস্ট ক্রিকেটের পরিচিতি সীমাবদ্ধ রাখতে হয়।

উনিশশো আটচল্লিশ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে তিনজন বাঙ্গালী বোলার দলভুক্ত হন। তৃতীয় টেস্টে মন্টু ব্যানার্জী, মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্টে পুঁটু চৌধুরী এবং বোম্বাইয়ের ব্রাবোন স্টেডিয়ামে সুটে ব্যানার্জী। মন্টু ব্যানার্জী ও সুটে ব্যানার্জী প্রত্যেকেই একটি করে টেস্ট খেলেছেন এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে পাঁচটি করে উইকেটও লাভ করেছিলেন। কিন্তু খেলার মাঠে দক্ষতাই বোধ হয় দলে স্থান লাভের একমাত্র মাপকাঠি নয়। তাই দুজনকে আর পরবর্তী খেলায় স্থান দেওয়া হয় নি। পুঁটু চৌধুরী জীবনে দুটি টেস্ট খেলেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পেয়েছিলেন একটি উইকেট।

সুটে ব্যানার্জী ও মন্টু ব্যানার্জী দুজনই যে যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুজনের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে মুখ্যতঃ নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থেই। কিন্তু দক্ষতা দেখানো সত্ত্বেও তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর সেটা করা হয়েছে ঘরোয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে রাজনীতির বীজ ছড়িয়ে। তৃতীয় টেস্টে মন্টু ব্যানার্জীর

সাফল্যের পর চতুর্থ টেস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয় মুখ্যতঃ পুঁটু চৌধুরীর স্বার্থে। পুঁটু তখন মোহনবাগানে খেলেন। পুঁটুর উপর দীর্ঘদিন ধরে অবিচার চলেছে সেই যুক্তি খাঁড়া করে পুঁটুকে মন্টু ব্যানার্জীর বদলে মাদ্রাজ টেস্টে স্থান দেওয়া হয়েছিল। সুটে-মন্টু-পুঁটু এই তিন খেলোয়াড়কে নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী রাজনীতি করেছেন নিজেদের স্বার্থে। আর এই রাজনীতির পেছনে এরাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য যেমন রয়েছেন ঠিক তেমন রয়েছেন অধিনায়ক লালা অমরনাথ।

লালা অমরনাথ নিঃসন্দেহে উঁচু দরের খেলোয়াড়। অধিনায়ক হিসেবেও তিনি তাঁর দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর বড়ো গুণ ছিল যুক্তির সাহায্যে যে কোন ব্যক্তিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার। আর দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে লালা অমরনাথের সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া ছিল নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য এম দত্ত রায়ের। উনিশশো আটচল্লিশ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যখন প্রথম দুটি টেস্টে ছ'শোর উপর রান তুললো তখন অমরনাথ বুঝলেন আগন্তুক দলের গতিরোধ করতে হলে দরকার ভাল সুইং বোলারের। ইডেনের উইকেট সুইং বোলারের সহায়ক তাই অমরনাথ প্রস্তাব দিলেন মন্টু ব্যানার্জীকে দলভুক্ত করতে।

মন্টু ব্যানার্জী তখন স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলোয়াড়। পঙ্কজ গুপ্ত ও এম দত্তরায় দুজনেই চান মন্টু দলভুক্ত হোন। আর তাছাড়া ঐ বছরেই নভেম্বর মাসে ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে মন্টু ব্যানার্জী উইকেট পেয়েছিলেন চারটি। সুটে ব্যানার্জী পেয়েছিলেন তিনটি উইকেট। তখন দলীপ ট্রফির প্রচলন না থাকলেও আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। পূর্বাঞ্চলের পক্ষে আর যাঁরা খেলেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হলো ভিনু মানকড় ও সারভাতে। পশ্চিমাঞ্চল দলে খেলেছিলেন কে সি ইব্রাহিম, পলি উমরিগড়, বিজয় হাজারে, দাতু ফাদকর, গুল মহম্মদ, সোহনা, সিন্ধে, এম এম দালভি, উদয় মার্চেন্ট, মাধব মন্ত্রী ও ওঝা।

কলকাতায় টেস্টের আগের দিন মন্টু ব্যানার্জীও চিন্তিত ছিলেন কিভাবে প্রতিপক্ষের নামী খেলোয়াড়দের তাঁবুতে ফিরিয়ে দেবেন। দুটি টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ছ'জন ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরী করেছেন। দ্বিতীয় টেস্টে সেঞ্চুরী করেছেন এ এফ রে। রের সঙ্গে হয় স্টলমেয়ার নয় এ্যাটকিনসন দলের গোড়াপত্তন করতে নামবেন। খেলার দিন সকালে মন্টু ব্যানার্জী অনেক আগেই মাঠে এসে হাজির। নেটে কিছুটা অনুশীলন করলেন আর তখনই মনে মনে স্থির করলেন আজ শুরুতেই অঘটন ঘটাতে হবে। মন্টু ব্যানার্জী, যার পোষাকী নাম সুধাংশু ব্যানার্জী, শুরুতেই ইডেনে আলোড়ন জাগালেন যখন চতুর্থ বলেই এ্যাটকিনসনের অফ স্টাম্প উৎপাটিত হলো। আধ ঘন্টা বাদে রে'কে এল বি ডবিলউ করলেন আর তার পরই মাঠে ডিগবাজী দিয়ে ওয়ালকটের ক্যাচ ধরলেন। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে রঙ্গচারী ২৭ রানের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম তিনটি উইকেট দখল করেছিলেন। প্রথম টেস্টে রঙ্গচারী পেয়েছিলেন পাঁচটি উইকেট। প্রথম টেস্টে ভালো বল করার জন্য রঙ্গচারীর দ্বিতীয় টেস্টে স্থান মিলেছিল। প্রথম দুটি টেস্টে অপর সূচনাকারী বোলার ফাদকর পেয়েছিলেন মাত্র একটি উইকেট। তৃতীয় টেস্টে ফাদকর ও রঙ্গচারী দুজনেই দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তৃতীয় টেস্টে মন্টু ব্যানার্জীর সঙ্গে নতুন বলের দায়িত্বে ছিলেন লালা অমরনাথ। অমরনাথ প্রথম ইনিংসে কোন উইকেট পান নি। দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন দুটি উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৩৬৬। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ৩৬৬ রানে ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। মন্টু ব্যানার্জী ও গোলাম আমেদ প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন চারটি করে উইকেট। ভিনু মানকড় দখল করেছিলেন দুটি উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে মানকড় পেয়েছিলেন তিনটি উইকেট। অমরনাথ ও গোলাম আমেদ দুটি করে। মন্টু ব্যানার্জী পেয়েছিলেন একটি উইকেট। রান আউট হয়েছিলেন এ এফ রে।

টেস্টে মন্টু ব্যানার্জীকে আর দলভুক্ত করা না হলেও মন্টু কিন্তু ঐ বছরই হোলকারের বিরুদ্ধে রণজি ট্রফিতে মারাত্মক বল করেন। প্রথম ইনিংসে ৬০ ওভার বল করে ৪৭ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন তিনটি উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১ ওভারে ৫০ রানে পেয়েছিলেন সাতটি উইকেট। মন্টু ব্যানার্জীর প্রশংসনীয় বোলিং সত্বেও বাংলা এ খেলায় পরাজিত হয় ১২৮ রানে। রণজি ট্রফি খেলা হলেই মন্টুর মনে পড়ে ১৯৫২ সালের কথা। চক্রান্ত করে বিহারের বিরুদ্ধে তাকে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। মন্টু ব্যানার্জীর কথাতেই বলি 'ল্যাঙ্কাশায়ারের রয়টন থেকে খেলে ফিরে এসেছি। ওখানে আমি ভালই বল করেছি। উইকেট পেয়েছি ৮০-র উপর। দেশে ফিরে আসার পর চিঠিতে জানানো হয়েছে আমি বিহারের বিরুদ্ধে বাংলা দলে মনোনীত হয়েছি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে চিঠি দিয়ে জানালাম বিশ্রামের প্রয়োজন। কদিন অনুশীলনে যেতে পারবো না। তবে বিহারের বিরুদ্ধে ভালো বল করার জন্য আমি অনাস্থানে নিজেকে তৈরী করে নেব। বিহারের সঙ্গে খেলার আগেরদিন আমি ইডেনে প্রবেশ করছি হঠাৎ জনৈক শুভানুধ্যায়ী আমাকে প্যাভেলিয়নে যেতে নিষেধ করলেন। কারণ নির্বাচকমণ্ডলীর সভা বসেছে। আমি অনুশীলনে আসি নি বলে আমার স্থানে অন্য খেলোয়াড়কে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বুঝতে পারলাম আমাকে সরিয়ে স্বার্থান্বেশী কর্মকর্তারা তাদের নিজেদের পছন্দমাফিক খেলোয়াড়কে খেলাবেন। আমি স্থির করলাম প্রতিবাদ জানাবো। প্যাভেলিয়নে প্রবেশ করেই দেখা হলো নির্বাচক-মণ্ডলীর চেয়ারম্যানের সঙ্গে। ইনি ময়দানের ফুটবলে দুই প্রধানের অন্যতম দলের কর্মকর্তা। আমাকে মিষ্টি কথায় বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন উঠতি খেলোয়াড়কে দলে স্থান দেওয়ার জন্য আমার বিহারের বিরুদ্ধে না খেলা উচিত। হঠাৎ আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেললো। বললাম এ তো ভালো কথা। তবে আমার বদলে যে

খেলোয়াড় খেলবেন তিনি আমার মনোনীত হবেন। কর্মকর্তাটি খুশী হলেন। আমাকে উপস্থিত করলেন নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের সামনে। সবাই উৎকন্ঠিত কার নাম প্রস্তাব করি। বললাম আমার বদলে রবি ব্যানার্জীকে দলভুক্ত করা হোক। রবি ব্যানার্জী কে? বললাম রবি আমার ছেলে। ওর বয়স ৯ বছর। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা অসন্তুষ্ট হলেও ঐ খেলায় আমাকে বসাতে সাহস পান নি। আর ঐ খেলায় আমি উইকেট পেয়েছিলাব ছ'টি ঐ বছর রণজি ট্রফিতে আমার উইকেট ছিল ২৬। সেদিন ঠাট্টার ছলে যার কথা বলেছিলাম সেই রবি অবশ্য পরবর্তীকালে বাংলার হয়ে খেলেছে। কিন্তু আমার মতো ওকেও নির্বাচকমণ্ডলীর খামখেয়ালীপনার শিকার হতে হয়েছে। আমি বুঝেছিলাম নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যই নিজের স্বার্থ অনুযায়ী চলে। আর তাছাড়া এখন রাজনীতিতেও এই একই ঘটনা ঘটছে। বাবা/মার সঙ্গে ছেলেও রাজনীতিতে প্রবেশ করছে। দেখ শ্যামসুন্দর, প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থ নিয়ে চলছে। যে বছর আমাকে রণজি ট্রফি থেকে বসাতে চেয়েছিল সেই সিরিজে আমি উইকেট পেয়েছিলাম ছাব্বিশটি। তা সত্ত্বেও কর্মকর্তারা বসাতে চেয়েছেন। টেস্টে ভালো বল করা সত্ত্বেও পরবর্তী টেস্টে আর খেলার সুযোগ পাই নি, অথচ বিভিন্ন প্রতিনিধিত্ব মূলক খেলায় আমি ভালো খেলেছি। অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আমি কখনই আপোশ করি নি। বোধহয় বাবা অবিনাশ ব্যানার্জী ও দাদা হিমাংশু ব্যানার্জীর প্রভাব আমার উপর পড়েছিল। বাবা পেশায় ছিলেন উকিল। স্বাধীন পেশায় অন্যায়ের সঙ্গে কখনই আপোষ করেন নি। দাদা দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই একই পথে চলেছেন। আমার বয়স এখন ৬০। (জন্ম ১লা নভেম্বর, ১৯১৯)। কর্মজীবনে আমি সোজা পথেই চলেছি, আর ছেলেদেরও শিক্ষা দিয়েছি জীবনে চলার পথে, সোজা ব্যাটে খেলতে।

বিতর্কিত বোলার

পুঁটু চৌধুরী

যে ক'জন বাঙ্গালী খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেটে খেলেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত খেলোয়াড় হলেন নীরদ চৌধুরী। খেলোয়াড়মহলে নীরদের বদলে পুঁটু নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। পুঁটুর কৈশোর কেটেছে জামসেদপুরে (জন্ম ১২ই মে ১৯২৩ সাল)। বিহারের হয়ে শুধু রণজি ট্রফি নয়, জাতীয় ফুটবলও খেলেছেন। ১৯৪১ সালে সন্তোষ ট্রফির খেলায় পুঁটু উত্তর প্রদেশ ও বাংলার বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। জামসেদপুরের ডালমা ড্রাগনের হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলায় অংশ নিয়েছেন, এ্যাথলেট হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছেন। বিহার অলিম্পিকের উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে হাইজ্যাম্পে পুঁটু প্রথম স্থান লাভ করেন। কলকাতার এরিয়ান্সের হয়ে পুঁটু হকিও

খেলেছেন। তবু ক্রিকেটের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি সমস্ত খেলা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ১৯৪২ সাল থেকেই ক্রিকেটে পুঁটুর দক্ষতা ভবিষ্যতে বড়ো ক্রিকেটার হওয়ার আভাষ দিয়েছিল। ১৯৪২ সালে রণজি ট্রফির প্রথম বছরেই পুঁটু বাংলার বিপক্ষে ৭৯ রানে সাতটি উইকেট লাভ করে ক্রিকেট মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

এই দক্ষতা দেখানোর ফলেই ১৯৪২ সালে লাহোরে আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেটে প্রতিযোগিতায় পুঁটু খেলার সুযোগ পান। ওই খেলায় উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়েরা হলেন লালা অমরনাথ, জাহাঙ্গীর খাঁন, নজর মহম্মদ ও জে এন ভায়া। পুঁটু বিহারে তিন বছর খেলার পরেই চলে আসেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য বিহারের তুলনায় কলকাতায় খেলার সুযোগ বেশী। আর ভালো ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বল করার সুযোগে নিজেকে আরো ভালোভাবে তৈরী করতে পারবেন। বাংলার হয়ে রণজি ট্রফিতে ভাল খেললেও পুঁটুর টেষ্ট প্রবেশের পথে প্রথম ও প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো এ রাজ্যের ক্রিকেট কর্মকর্তারা। তারা অভিযোগ তুললো পুঁটু ছুঁড়ে বল করেন। শেষ পর্যন্ত পুঁটু যে ছুঁড়ে বল করেন না তার সমর্থনে তাকে ইংল্যাণ্ডে গ্রোভার স্কুলে যেতে হলো ১৯৫০ সালে। অথচ এর আগে পুঁটু ভারতের হয়ে একটি টেষ্টে খেলেছেন। রণজি ট্রফিতে নিয়মিত খেলে চলেছেন। গ্রোভার স্কুল থেকে যখন ঘোষণা করা হলো পুঁটুর বোলিং এ্যাকশনে কোন খুঁত নেই, তখন ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী পাল্টা রব তুললেন পুঁটুর বোলিং এ্যাকশন পরিবর্তন করা হয়েছে, ওর বলে আগের মতো জোর নেই। কিন্তু তাসত্ত্বেও ১৯৫১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্টে তাকে দলভুক্ত করা হয়। দু'ইনিংসে ভাল বল করলেও পুঁটুর ভাগ্যে কোন উইকেট মেলেনি। তবে ঐ সময় প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় ভালো বল করায় ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে পুঁটুকে দলে স্থান দেওয়া হয়।

ভারতীয় ক্রিকেট দল যখন ইংল্যাণ্ড সফরে যায় তখনই এদেশের নির্বাচকমণ্ডলী এরাজ্যের ক্রিকেটারদের কথা বিশেষ করে ভাবে। কারণ এরাজ্যের আবহাওয়া সিম বোলারের সহায়ক। তাই তাদের ধারণা ইংল্যাণ্ডের স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় বাংলার বোলাররা অন্য রাজ্যের তুলনায় দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন। যে সাতজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় টেষ্ট ক্রিকেটে খেলেছেন তাদের মধ্যে চারজন হচ্ছেন নতুন বলের বোলার আর এঁদের মধ্যে তিনজন ইংল্যাণ্ড সফর করেছেন। সুঁটে ব্যানার্জী ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে ছিলেন ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড়। ১৯৫২ সালে পরবর্তী ইংল্যাণ্ড সফরে নীরদ (পুঁটু) চৌধুরীকে দলভুক্ত করা হয়। আর সব শেষে ১৯৬৭ সালে সুব্রত গুহ ইংল্যাণ্ড সফর করেছেন। এই তিনজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র সুব্রত গুহই ইংল্যাণ্ডে একটি টেষ্ট খেলার সুযোগ পান। আরো একজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় এরপরও ইংল্যাণ্ড সফর করেছিলেন। কিন্তু সুঁটে ও পুঁটুর মতো তার ভাগ্যেও ইংল্যাণ্ডে টেষ্ট খেলার সুযোগ মেলেনি। খেলোয়াড়টির নাম গোপাল বসু। বেসরকারী খেলার মধ্যেই গোপালের ক্রিকেট জীবনের সমাপ্তি ঘটে। অথচ ১৯৭৪ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেষ্টে গোপালের ভারতীয় দলের অন্তর্ভুক্তি একরূপ নিশ্চিত ছিল। টেষ্ট খেলার আগেরদিনও গোপালের মতো এরাজ্যের ক্রীড়ামোদীরাও জানতেন গোপাল ও ইঞ্জিনিয়ার ভারতীয় দলের গোড়াপত্তন করছেন। কিন্তু গোপালের জায়গায় শেষ পর্যন্ত অধিনায়ক মনসুর আলি খাঁন সোলকারকে দলে নিলেন। সোলকার দুই ইনিংসে করেছিলেন চার ও পনেরো। সুঁটে ব্যানার্জী ও পুঁটু চৌধুরী স্বদেশে টেষ্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন। গোপালের ভাগ্যে সরকারী টেস্ট খেলার আদৌ সুযোগ মেলেনি। অথচ বেসরকারী টেস্টের প্রথম আবির্ভাবেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গোপালের রয়েছে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব। ইংল্যাণ্ডে প্রথম শ্রেণীর খেলাতেও গোপাল মোটামুটি ভালোই খেলেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় দলে তাঁর স্থান মেলেনি। প্রথমে মনসুর আলি খাঁন ও পরে বেদী গোপালের ভারতীয় দলে স্থান লাভের পথে বাধার সৃষ্টি করেন। আর তাছাড়া দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে নির্বাচক হিসেবে পঙ্কজ রায় ও ফাদকর গোপালের প্রতি অন্যায়ের প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছেন।

সুটে ব্যানার্জীর উপর ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ যা ব্যবহার করেছেন পুঁটুর উপরও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার একমাস বাদেই ভারতে বসেছিল পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটের আসর। আশা করা গিয়েছিল পুঁটুকে হয়তো একটি টেস্টে স্থান দেওয়া হবে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কর্মকর্তারা পুঁটুর কথা আদৌ ভাবলেন না। পুঁটু শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই নয় ভারতীয় ক্রিকেট থেকেই চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম পাঁচটি টেস্টে যারা নতুন বলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একমাত্র ফাদকর ছাড়া পুঁটু যে কোন বোলারের আগে দলে আসতে পারেন। দিল্লীতে প্রথম টেস্টে নতুন বোলিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন রামচাঁদ ও লালা অমরনাথ। প্রথম ইনিংসে এরা কেউই কোন উইকেট পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে অমরনাথ পেয়েছিলেন একটি। দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানকে একটি ইনিংসেই ব্যাট করতে হয়েছিল, কারণ এই খেলায় তারা জয়লাভ করেছিল ইনিংস ও ৪৩ রান। অমরনাথ ও উমরিগড় বোলিং শুরু করেন, পরে নয়ালচাঁদ উমরিগড়ের জায়গায় বল করতে আসেন। অমরনাথ দুটি উইকেট পেয়েছিলেন। উমরিগড় একটিও নয়। নয়ালচাঁদ পেয়েছিলেন তিনটি উইকেট। নয়ালচাঁদের জীবনে ওটাই প্রথম ও শেষ টেস্ট খেলা। তৃতীয় টেস্টে দানীকে দিয়ে অমরনাথের সঙ্গে বোলিংয়ের সূচনা করতে দেওয়া হয়। চতুর্থ টেস্টে ফাদকর ও ডিভেচা খেলেন। পঞ্চম টেস্টে আবার ফাদকর ও রামচাঁদ।

ভারতীয় দলে স্থান না পাওয়ার জন্য পঁটু অবশ্য দোষারোপ করেছেন নির্বাচকমণ্ডলীতে বাংলার প্রতিনিধিকে। পঁটুর বক্তব্য "ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় দলের ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্তর লক্ষ্য ছিল পঙ্কজ রায় ও খোকন সেনকে টেস্টে দলভুক্ত করা আর সেজন্য টেস্ট তো দূরের কথা কাউন্টি ক্রিকেট খেলারও সুযোগ আমার খুব কমই মিলেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে স্থান না পাওয়ার মূলে রয়েছেন এম দত্তরায়। উনি খোকন সেন ও পঙ্কজ রায়ের উপরই দৃষ্টি দিয়েছিলেন বেশী।" এম দত্তরায় অবশ্য পঁটুর অভিযোগের উত্তরে বলেছেন 'পঁটু টেস্টে খেলার যোগ্যতা কোনদিনই তুলে ধরতে পারেন নি। তবে এটা ঠিক তখন পঙ্কজ রায়ের প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল বেশী। আর পঙ্কজকে দলভুক্তি করার ব্যাপারে যেমন আমি কৃতকার্য হয়েছি তেমন পঙ্কজও তার যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন।" পঁটুকে দুটি টেস্টে খেলালেও উইকেট পেয়েছেন মাত্র একটি। পঁটু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে পেয়েছিলেন একটি উইকেট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র একবারই ব্যাট করেছিল। সূচনাকারী দুই ব্যাটসম্যান—এ এফ রে ও জে বি স্টলমেয়ার সেঞ্চুরী করেছিলেন। এই খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করেছিল ইনিংস ও ১৯৩ রানে। পঁটু ৩৭ ওভারে ১৩০ রানের বিনিময়ে স্টলমেয়ারের উইকেটটি পেয়েছিলেন। আর এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন আর এক বাঙ্গালী খেলোয়াড় খোকন সেন। ক্যাচটি ধরতে তিনি আদৌ ভুল করেন নি। ১৯৫১-৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পঁটু তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট খেলেন। কিন্তু এ টেস্টের দুটি ইনিংসে কোন উইকেট পান নি। পঁটু উইকেট পান নি সত্যি, কিন্তু প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানেরা যে তাঁর বলকে বিশেষ সমীহ করে খেলেছিলেন তার প্রমাণ তার বোলিং গড়। প্রথম ইনিংসে ১৮ ওভারে দিয়েছিলেন ৩০ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১ ওভারে রান উঠেছিল মাত্র ৪৬। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরিজের আর চারটে খেলায় তাঁকে দলে স্থান দেওয়া হয় নি।

পঁটুর সমসাময়িক খেলোয়াড়দের মতে পঁটুকে ঠিকসময় ভারতীয় দলে স্থান দেওয়া হয় নি। ১৯৪৬ সালেই পঁটুকে ইংল্যাণ্ড সফরে স্থান দেওয়া উচিত ছিল। ১৯৪৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে পঁটু পূর্বাঞ্চলের হয়ে খেলতে নেমে দুই ইনিংসে পেয়েছিলেন ছ'টি উইকেট। এর মধ্যে রয়েছে অধিনায়ক হ্যাসেটের উইকেটটি। খেলার শেষে হ্যাসেট পঁটুর বোলিংয়ের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছিলেন। পঁটুর জীবনে অবশ্য সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব ভারতের তিন খ্যাতকীর্তি ব্যাটসম্যানকে পর পর তিন বলে ফিরিয়ে দেওয়ার সূত্রে হ্যাটট্রিক লাভ। মেজর জেনারেল স্টুয়ার্টস একাদশের বিরুদ্ধে বাংলার রাজ্যপাল দলের হয়ে খেলতে নেমে মুস্তাক আলি, লালা অমরনাথ ও ভিনু মানকড়কে পঁটু পর পর তিনটি বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে টেস্টে উইকেট না পেলেও রাজ্যপাল একাদশের হয়ে খেলতে নেমে আগন্তুক দলের বিরুদ্ধে ১০৫ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ছ'টি উইকেট। এই খেলার দক্ষতার জন্যেই পঁটুকে যেমন চতুর্থ টেস্টে দলে স্থান দেওয়া হয় ঠিক তেমন ১৯৪৯-৫০ ও ৫০-৫১ সালে কমনওয়েলথ একাদশের বিরুদ্ধে ভালো বল করার সূত্রেই ১৯৫১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি দলভুক্ত হন। প্রথম কমনওয়েলথ একাদশের বিরুদ্ধে বেসরকারী টেস্টে এবং দ্বিতীয় কমনওয়েলথ একাদশের বিরুদ্ধে তিনটি বেসরকারী টেস্টে পঁটু অংশ নেন। পাঁচটি খেলায় পঁটু চৌধুরী উইকেট পেয়েছিলেন একুশটি।

১৯৫১ সালের পর পুঁটু টেস্টে না খেললেও রণজি ট্রফিতে খেলেছেন ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। রণজি ট্রফিতে পঁটু চৌধুরী উইকেট পেয়েছেন ১২০টি। বোলিং গড় ১৯.৬৭। প্রথম জীবনে (১৯৪১-৪৩) রণজি ট্রফি খেলেছেন বিহারের পক্ষে। আবার জীবনের সায়াহ্নেও বিহারের হয়ে রণজি ট্রফি খেলেছেন (১৯৫৫-৫৭), মাঝে ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বাংলার হয়ে খেলেছেন। বাংলার হয়েই রণজি

ট্রফিতে উইকেট দখল করেছিলেন ৭৫টি। খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পর সি এ বি-র হয়ে দুবছর প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টের ক্রিকেট প্রশিক্ষক।

খেলোয়াড় জীবনে বিভিন্ন খেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলা ও হোলকারের মধ্যে রণজি ট্রফি ফাইনাল। এই খেলায় ফিল্ডিং করতে গিয়ে পুঁটু আহত হন। কিন্তু মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ঐ খেলায় পুঁটু ১৩ ওভার বল করেন। কিন্তু দুঃখ, জয়ের গোড়ায় এসেও শেষ উইকেটের পতন ঘটাতে না পারাতে বাংলার পক্ষে দ্বিতীয়-বার রণজি ট্রফি দখল করা সম্ভবপর হয় নি।

সফল ব্যাটসম্যান

পঙ্কজ রায়

টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে সফল বাঙ্গালী ক্রিকেটার হলেন পঙ্কজ রায়। পঙ্কজ রায়ের টেস্ট ক্রিকেটে প্রবেশ ১৯৫১ সালে দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে। জীবনের শেষ টেস্ট ৬০-৬১ সালে বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে। দীর্ঘ দশ বছরে পঙ্কজ রায় টেস্ট খেলেছেন ৪৩টি। রান করেছেন ২,৪৪১। সেঞ্চুরী করেছেন পাঁচটি। ভারতীয় দলের অধিনায়কও ছিলেন একবার। তবে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো টেস্টে প্রথম উইকেট জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড। ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে ভিনু মানকড়ের সহায়তায় পঙ্কজ রায় প্রথম উইকেটে ৪১৩ রান তুলে এক অনন্য

কৃতিত্বের নজীর রাখেন। ঐ খেলায় ভিনু করেছিলেন ২৩১ রান। পঙ্কজ রায় তুলেছিলেন ১৭৩ রান। দুজনের জীবনের সর্বোচ্চ রান।

ক্রিকেটে বোম্বের খেলোয়াড়েরা বরাবরই অহংকারী। ওরাজ্যের ক্রিকেটারদের চোখে পঙ্কজ কোনদিনই বড়ো খেলোয়াড় নন। পঙ্কজ রায়কে দল থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা এরা বরাবরই করেছেন। পঙ্কজ রায়ের ব্যর্থতাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে বোম্বের সংবাদপত্রগুলি। এদের অপচেষ্টায় হয়তো সাময়িক ভাবে পঙ্কজ রায় টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের জন্য পঙ্কজ রায়কে টেস্ট আসর থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ পঙ্কজের বড় গুণ তাঁর সাধনা ও একাগ্রতা ও সেই সঙ্গে লড়িয়ে মনোভাব।

টেস্ট ক্রিকেটে পঙ্কজ রায় ১৯৪৮ সালেই প্রবেশ করতে পারতেন যদি তিনি বোম্বের অধিবাসী হতেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল যখন ভারত সফরে এলো তখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খেলার জন্য ডাক পড়লো পঙ্কজ রায়ের। কলকাতা মাঠে বিদ্যাসাগর কলেজ ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে পঙ্কজ তখন প্রায় প্রতিদিনই সেঞ্চুরী করছেন। ১৯৪৬ সালে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে রণজি ট্রফিতে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরী। সেঞ্চুরী করেছেন পরের বছর হোলকারের মত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধেও। যে খেলায় প্রতিপক্ষ দলে খেলেছিলেন সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, মুস্তাক আলি, নিম্বলকার, সারভাতে প্রভৃতি খেলোয়াড়েরা। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সূচনাকারী ব্যাটসম্যান হিসেবে দলে স্থান পেলেও পঙ্কজকে ব্যাট করতে পাঠানো হয়েছিল এগারো নম্বর। অথচ ঐ খেলায় শতরান করার সুযোগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে উমরিগড় টেস্ট দলে স্থান পান। পঙ্কজ রায় এই অপমানের জবাব দিয়েছিলেন ঐ বছরই কলকাতা মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। গভর্ণর একাদশের পক্ষে খেলতে নেমে পঙ্কজ রায় করেছিলেন অপরাজিত ১০১ রান। উনিশশো আটচল্লিশ সালে যার

খেলেছেন। তবু ক্রিকেটের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি সমস্ত খেলা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ১৯৪২ সাল থেকেই ক্রিকেটে পুঁটুর দক্ষতা ভবিষ্যতে বড়ো ক্রিকেটার হওয়ার আভাষ দিয়েছিল। ১৯৪২ সালে রণজি ট্রফির প্রথম বছরেই পুঁটু বাংলার বিপক্ষে ৭৯ রানে সাতটি উইকেট লাভ করে ক্রিকেট মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

এই দক্ষতা দেখানোর ফলেই ১৯৪২ সালে লাহোরে আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেটে প্রতিযোগিতায় পুঁটু খেলার সুযোগ পান। ওই খেলায় উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়েরা হলেন লালা অমরনাথ, জাহাঙ্গীর খাঁন, নজর মহম্মদ ও জে এন ভায়া। পুঁটু বিহারে তিন বছর খেলার পরেই চলে আসেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য বিহারের তুলনায় কলকাতায় খেলার সুযোগ বেশী। আর ভালো ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বল করার সুযোগে নিজেকে আরো ভালোভাবে তৈরী করতে পারবেন। বাংলার হয়ে রণজি ট্রফিতে ভাল খেললেও পুঁটুর টেস্ট প্রবেশের পথে প্রথম ও প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো এ রাজ্যের ক্রিকেট কর্মকর্তারা। তারা অভিযোগ তুললো পুঁটু ছুঁড়ে বল করেন। শেষ পর্যন্ত পুঁটু যে ছুঁড়ে বল করেন না তার সমর্থনে তাকে ইংল্যাণ্ডে গ্রোভার স্কুলে যেতে হলো ১৯৫০ সালে। অথচ এর আগে পুঁটু ভারতের হয়ে একটি টেস্টে খেলেছেন। রণজি ট্রফিতে নিয়মিত খেলে চলেছেন। গ্রোভার স্কুল থেকে যখন ঘোষণা করা হলো পুঁটুর বোলিং এ্যাকশনে কোন খুঁত নেই, তখন ভারতীয় নিবাচকমণ্ডলী পাল্টা রব তুললেন পুঁটুর বোলিং এ্যাকশন পরিবর্তন করা হয়েছে, ওর বলে আগের মতো জোর নেই। কিন্তু তাসত্ত্বেও ১৯৫১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে তাকে দলভুক্ত করা হয়। দু'ইনিংসে ভাল বল করলেও পুঁটুর ভাগ্যে কোন উইকেট মেলেনি। তবে ঐ সময় প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় ভালো বল করায় ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে পুঁটুকে দলে স্থান দেওয়া হয়।

ভারতীয় ক্রিকেট দল যখন ইংল্যাণ্ড সফরে যায় তখনই এদেশের নির্বাচকমণ্ডলী এরাজ্যের ক্রিকেটারদের কথা বিশেষ করে ভাবে। কারণ এরাজ্যের আবহাওয়া সিম বোলারের সহায়ক। তাই তাদের ধারণা ইংল্যাণ্ডের স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় বাংলার বোলাররা অন্য রাজ্যের তুলনায় দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন। যে সাতজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেটে খেলেছেন তাদের মধ্যে চারজন হচ্ছেন নতুন বলের বোলার আর এঁদের মধ্যে তিনজন ইংল্যাণ্ড সফর করেছেন। সুটে ব্যানার্জী ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে ছিলেন ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড়। ১৯৫২ সালে পরবর্তী ইংল্যাণ্ড সফরে নীরদ (পুঁটু) চৌধুরীকে দলভুক্ত করা হয়। আর সব শেষে ১৯৬৭ সালে সুব্রত গুহ ইংল্যাণ্ড সফর করেছেন। এই তিনজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র সুব্রত গুহই ইংল্যাণ্ডে একটি টেস্ট খেলার সুযোগ পান। আরো একজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় এরপরও ইংল্যাণ্ড সফর করেছিলেন। কিন্তু সুটে ও পুঁটুর মতো তার ভাগ্যেও ইংল্যাণ্ডে টেস্ট খেলার সুযোগ মেলেনি। খেলোয়াড়টির নাম গোপাল বসু। বেসরকারী খেলার মধ্যেই গোপালের ক্রিকেট জীবনের সমাপ্তি ঘটে। অথচ ১৯৭৪ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে গোপালের ভারতীয় দলের অন্তর্ভুক্তি একরূপ নিশ্চিত ছিল। টেস্ট খেলার আগেরদিনও গোপালের মতো এরাজ্যের ক্রীড়ামোদীরাও জানতেন গোপাল ও ইঞ্জিনিয়ার ভারতীয় দলের গোড়াপত্তন করছেন। কিন্তু গোপালের জায়গায় শেষ পর্যন্ত অধিনায়ক মনসুর আলি খাঁন সোলকারকে দলে নিলেন। সোলকার দুই ইনিংসে করেছিলেন চার ও পনেরো। সুটে ব্যানার্জী ও পুঁটু চৌধুরী স্বদেশে টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন। গোপালের ভাগ্যে সরকারী টেস্ট খেলার আদৌ সুযোগ মেলেনি। অথচ বেসরকারী টেস্টের প্রথম আবির্ভাবেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গোপালের রয়েছে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব। ইংল্যাণ্ডে প্রথম শ্রেণীর খেলাতেও গোপাল মোটামুটি ভালোই খেলেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় দলে তাঁর স্থান মেলেনি। প্রথমে মনসুর আলি খাঁন ও পরে বেদী গোপালের ভারতীয় দলে স্থান লাভের পথে বাধার সৃস্টি করেন। আর তাছাড়া দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে নির্বাচক হিসেবে পঙ্কজ রায় ও ফাদকর গোপালের প্রতি অন্যায়ের প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছেন।

সুটে ব্যানার্জীর উপর ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ যা ব্যবহার করেছেন পুঁটুর উপরও সেই একই দৃস্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার একমাস বাদেই ভারতে বসেছিল পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটের আসর। আশা করা গিয়েছিল পুঁটুকে হয়তো একটি টেস্টে স্থান দেওয়া হবে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কর্মকর্তারা পুঁটুর কথা আদৌ ভাবলেন না। পুঁটু শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই নয় ভারতীয় ক্রিকেট থেকেই চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম পাঁচটি টেস্টে যারা নতুন বলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একমাত্র ফাদকর ছাড়া পুঁটু যে কোন বোলারের আগে দলে আসতে পারেন। দিল্লীতে প্রথম টেস্টে নতুন বোলিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন রামচাঁদ ও লালা অমরনাথ। প্রথম ইনিংসে এরা কেউই কোন উইকেট পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে অমরনাথ পেয়েছিলেন একটি। দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানকে একটি ইনিংসেই ব্যাট করতে হয়েছিল, কারণ এই খেলায় তারা জয়লাভ করেছিল ইনিংস ও ৪৩ রান। অমরনাথ ও উমরিগড় বোলিং শুরু করেন, পরে নয়ালচাঁদ উমরিগড়ের জায়গায় বল করতে আসেন। অমরনাথ দুটি উইকেট পেয়েছিলেন। উমরিগড় একটিও নয়। নয়ালচাঁদ পেয়েছিলেন তিনটি উইকেট। নয়ালচাঁদের জীবনে ওটাই প্রথম ও শেষ টেস্ট খেলা। তৃতীয় টেস্টে দানীকে দিয়ে অমরনাথের সঙ্গে বোলিংয়ের সূচনা করতে দেওয়া হয়। চতুর্থ টেস্টে ফাদকর ও ডিভেচা খেলেন। পঞ্চম টেস্টে আবার ফাদকর ও রামচাঁদ।

ভারতীয় দলে স্থান না পাওয়ার জন্য পঁটু অবশ্য দোষারোপ করেছেন নির্বাচকমণ্ডলীতে বাংলার প্রতিনিধিকে। পঁটুর বক্তব্য "ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় দলের ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্তর লক্ষ্য ছিল পঙ্কজ রায় ও খোকন সেনকে টেস্টে দলভুক্ত করা আর সেজন্য টেস্ট তো দূরের কথা কাউন্টি ক্রিকেট খেলারও সুযোগ আমার খুব কমই মিলেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে স্থান না পাওয়ার মূলে রয়েছেন এম দত্তরায়। উনি খোকন সেন ও পঙ্কজ রায়ের উপরই দৃষ্টি দিয়েছিলেন বেশী।" এম দত্তরায় অবশ্য পঁটুর অভিযোগের উত্তরে বলেছেন 'পঁটু টেস্টে খেলার যোগ্যতা কোনদিনই তুলে ধরতে পারেন নি। তবে এটা ঠিক তখন পঙ্কজ রায়ের প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল বেশী। আর পঙ্কজকে দলভুক্তি করার ব্যাপারে যেমন আমি কৃতকার্য হয়েছি তেমন পঙ্কজও তার যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন।" পঁটুকে দুটি টেস্টে খেলালেও উইকেট পেয়েছেন মাত্র একটি। পঁটু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে পেয়েছিলেন একটি উইকেট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র একবারই ব্যাট করেছিল। সূচনাকারী দুই ব্যাটসম্যান—এ এফ রে ও জে বি ষ্টলমেয়ার সেঞ্চুরী করেছিলেন। এই খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করেছিল ইনিংস ও ১৯৩ রানে। পঁটু ৩৭ ওভারে ১৩০ রানের বিনিময়ে ষ্টলমেয়ারের উইকেটটি পেয়েছিলেন। আর এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন আর এক বাঙ্গালী খেলোয়াড় খোকন সেন। ক্যাচটি ধরতে তিনি আদৌ ভুল করেন নি। ১৯৫১-৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পঁটু তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট খেলেন। কিন্তু এ টেস্টের দুটি ইনিংসে কোন উইকেট পান নি। পঁটু উইকেট পান নি সত্যি, কিন্তু প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানেরা যে তাঁর বলকে বিশেষ সমীহ করে খেলেছিলেন তার প্রমাণ তার বোলিং গড়। প্রথম ইনিংসে ১৮ ওভারে দিয়েছিলেন ৩০ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১ ওভারে রান উঠেছিল মাত্র ৪৬। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরিজের আর চারটে খেলায় তাঁকে দলে স্থান দেওয়া হয় নি।

পঁটুর সমসাময়িক খেলোয়াড়দের মতে পঁটুকে ঠিকসময় ভারতীয় দলে স্থান দেওয়া হয় নি। ১৯৪৬ সালেই পঁটুকে ইংল্যাণ্ড সফরে স্থান দেওয়া উচিত ছিল। ১৯৪৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে পঁটু পূর্বাঞ্চলের হয়ে খেলতে নেমে দুই ইনিংসে পেয়েছিলেন ছ'টি উইকেট। এর মধ্যে রয়েছে অধিনায়ক হ্যাসেটের উইকেটটি। খেলার শেষে হ্যাসেট পঁটুর বোলিংয়ের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছিলেন। পঁটুর জীবনে অবশ্য সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব ভারতের তিন খ্যাতকীর্তি ব্যাটসম্যানকে পর পর তিন বলে ফিরিয়ে দেওয়ার সূত্রে হ্যাটট্রিক লাভ। মেজর জেনারেল স্টুয়ার্টস একাদশের বিরুদ্ধে বাংলার রাজ্যপাল দলের হয়ে খেলতে নেমে মুস্তাক আলি, লালা অমরনাথ ও ভিনু মানকড়কে পঁটু পর পর তিনটি বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে টেস্টে উইকেট না পেলেও রাজ্যপাল একাদশের হয়ে খেলতে নেমে আগন্তুক দলের বিরুদ্ধে ১০৫ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ছ'টি উইকেট। এই খেলার দক্ষতার জন্যেই পঁটুকে যেমন চতুর্থ টেস্টে দলে স্থান দেওয়া হয় ঠিক তেমন ১৯৪৯-৫০ ও ৫০-৫১ সালে কমনওয়েলথ একাদশের বিরুদ্ধে ভালো বল করার সূত্রেই ১৯৫১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি দলভুক্ত হন। প্রথম কমনওয়েলথ একাদশের বিরুদ্ধে বেসরকারী টেস্টে এবং দ্বিতীয় কমনওয়েলথ একাদশের বিরুদ্ধে তিনটি বেসরকারী টেস্টে পঁটু অংশ নেন। পাঁচটি খেলায় পঁটু চৌধুরী উইকেট পেয়েছিলেন একুশটি।

১৯৫১ সালের পর পুঁটু টেস্টে না খেললেও রণজি ট্রফিতে খেলেছেন ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। রণজি ট্রফিতে পঁটু চৌধুরী উইকেট পেয়েছেন ১২০টি। বোলিং গড় ১৯.৬৭। প্রথম জীবনে (১৯৪১-৪৩) রণজি ট্রফি খেলেছেন বিহারের পক্ষে। আবার জীবনের সায়াহ্নেও বিহারের হয়ে রণজি ট্রফি খেলেছেন (১৯৫৫-৫৭), মাঝে ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বাংলার হয়ে খেলেছেন। বাংলার হয়েই রণজি

ট্রফিতে উইকেট দখল করেছিলেন ৭৫টি। খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পর সি এ বি-র হয়ে দুবছর প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টের ক্রিকেট প্রশিক্ষক।

খেলোয়াড় জীবনে বিভিন্ন খেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলা ও হোলকারের মধ্যে রণজি ট্রফি ফাইনাল। এই খেলায় ফিল্ডিং করতে গিয়ে পঁুটু আহত হন। কিন্তু মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ঐ খেলায় পঁুটু ১৩ ওভার বল করেন। কিন্তু দুঃখ, জয়ের গোড়ায় এসেও শেষ উইকেটের পতন ঘটাতে না পারাতে বাংলার পক্ষে দ্বিতীয়-বার রণজি ট্রফি দখল করা সম্ভবপর হয় নি।

সফল ব্যাটসম্যান

পঙ্কজ রায়

টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে সফল বাঙ্গালী ক্রিকেটার হলেন পঙ্কজ রায়। পঙ্কজ রায়ের টেস্ট ক্রিকেটে প্রবেশ ১৯৫১ সালে দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে। জীবনের শেষ টেস্ট ৬০-৬১ সালে বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে। দীর্ঘ দশ বছরে পঙ্কজ রায় টেস্ট খেলেছেন ৪৩টি। রান করেছেন ২,৪৪১। সেঞ্চুরী করেছেন পাঁচটি। ভারতীয় দলের অধিনায়কও ছিলেন একবার। তবে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো টেস্টে প্রথম উইকেট জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড। ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে ভিনু মানকড়ের সহায়তায় পঙ্কজ রায় প্রথম উইকেটে ৪১৩ রান তুলে এক অনন্য

কৃতিত্বের নজীর রাখেন। ঐ খেলায় ভিনু করেছিলেন ২৩১ রান। পঙ্কজ রায় তুলেছিলেন ১৭৩ রান। দুজনের জীবনের সর্বোচ্চ রান।

ক্রিকেটে বোম্বের খেলোয়াড়েরা বরাবরই অহংকারী। ওরাজ্যের ক্রিকেটারদের চোখে পঙ্কজ কোনদিনই বড়ো খেলোয়াড় নন। পঙ্কজ রায়কে দল থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা এরা বরাবরই করেছেন। পঙ্কজ রায়ের ব্যর্থতাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে বোম্বের সংবাদপত্রগুলি। এদের অপচেষ্টায় হয়তো সাময়িক ভাবে পঙ্কজ রায় টেষ্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের জন্য পঙ্কজ রায়কে টেষ্ট আসর থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ পঙ্কজের বড় গুণ তাঁর সাধনা ও একাগ্রতা ও সেই সঙ্গে জড়িয়ে মনোভাব।

টেষ্ট ক্রিকেটে পঙ্কজ রায় ১৯৪৮ সালেই প্রবেশ করতে পারতেন যদি তিনি বোম্বের অধিবাসী হতেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল যখন ভারত সফরে এলো তখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খেলার জন্য ডাক পড়লো পঙ্কজ রায়ের। কলকাতা মাঠে বিদ্যাসাগর কলেজ ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে পঙ্কজ তখন প্রায় প্রতিদিনই সেঞ্চুরী করছেন। ১৯৪৬ সালে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে রণজি ট্রফিতে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরী। সেঞ্চুরী করেছেন পরের বছর হোলকারের মত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধেও। যে খেলায় প্রতিপক্ষ দলে খেলেছিলেন সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, মুস্তাক আলি, নিম্বলকার, সারভাতে প্রভৃতি খেলোয়াড়েরা। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সূচনাকারী ব্যাটসম্যান হিসেবে দলে স্থান পেলেও পঙ্কজকে ব্যাট করতে পাঠানো হয়েছিল এগারো নম্বর। অথচ ঐ খেলায় শতরান করার সুযোগে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে উমরিগড় টেষ্ট দলে স্থান পান। পঙ্কজ রায় এই অপমানের জবাব দিয়েছিলেন ঐ বছরই কলকাতা মাঠে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। গভর্ণর একাদশের পক্ষে খেলতে নেমে পঙ্কজ রায় করেছিলেন অপরাজিত ১০১ রান। উনিশশো আটচল্লিশ সালে যার

তৃতীয়। চারটি টেস্টের আট ইনিংসে পঙ্কজের রান ৩৮৩। ব্যাটিং শীর্ষে উমরিগড়। তাঁর রান ৫৬০। মাধব আপ্তের রান ৪৬০। ইংল্যাণ্ড ও পাকিস্তানের দুটি সফরে সাতটি টেস্টে পঙ্কজ যেখানে সংগ্রহ করেছেন মাত্র ১৩০ সেখানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটি টেস্টে তাঁর রান ২৩৫। সবচেয়ে বড়ো কথা ক্রমাগত ব্যর্থতায় যখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে সেই সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাঠই পঙ্কজকে ফিরিয়ে দিল তাঁর মনোবল। পঙ্কজ রায় মনোবল ফিরে পেলেন সত্যি, কিন্তু পুরোপুরি ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের পর ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সফর। মাধব আপ্তের জায়গায় দলভুক্ত হলেন পি এল পাঞ্জাবী। প্রথম টেস্ট ঢাকায়। পঙ্কজ ও পাঞ্জাবী ভারতীয় দলের গোড়াপত্তন করতে গেলেন। কিন্তু পঙ্কজ কোন রান করার আগেই মামুদ হোসেনের বলে সরাসরি বোল্ড আউট হলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য পঙ্কজ তাঁর দক্ষতা তুলে ধরেছিলেন। মাত্র ১৭ রানে দুটি উইকেটের পতনের পর পঙ্কজ ও মঞ্জরেকারের দৃঢ়তায় খেলার শেষে ভারত করলো ২ উইকেটে ১৪৬। পঙ্কজ অপরাজিত ৬৭। মঞ্জরেকার অপরাজিত ৭৪। প্রথম টেস্টের মতো ভাওয়ালপুরে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে পঙ্কজ কোন রান করার আগেই ফজল মামুদের বলে বোল্ড আউট হন। দ্বিতীয় ইনিংসে আবার ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব। ৭৭ রান করে খাঁন মামুদের বলে কারদারের হাতে ক্যাচ আউট হন। পর পর দুটি টেস্টে প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতার জন্য কলকাতা ক্রিকেট মহলে একটা কথার প্রচলন হলো। পঙ্কজ দ্বিতীয় ইনিংস দিয়ে কেন খেলা শুরু করে না? পাকিস্তানে পরবর্তী তিনটি টেস্টে পঙ্কজ খুব একটা বেশী রান করতে পারেন নি। কিছুক্ষণ খেলার পর যখনই পঙ্কজের কাছে বড়ো রানের প্রত্যাশা করা হয়েছে ঠিক সেই সময়ই পঙ্কজ তাঁবুতে ফিরে গিয়েছেন। পাকিস্তানে পাঁচটি টেস্টই শেষ হয়েছিল অমীমাংসিত ভাবে। পাকিস্তান

ও ভারতের মধ্যে প্রথম দুটি সিরিজে টেস্ট খেলার সময় সীমা ছিল চারদিনের। পাকিস্তান সফরে পঙ্কজ রায়ই ছিলেন ভারতীয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী খেলোয়াড়। পঙ্কজের সংগৃহীত রান হলো ২৭২। উমরিগড় করেছিলেন ২৭১। মঞ্জরেকার ২৭০।

উনিশশো পঞ্চান্ন সালের নভেম্বরে নিউজিল্যাণ্ড এলো ভারত সফরে। পাকিস্তান সফরে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন ভিনু মানকড়। হায়দ্রাবাদে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে অধিনায়ক হলেন গোলাম আমেদ। প্রথম টেস্ট শেষ হয় অমীমাংসিত ভাবে। তবে ভারতের পক্ষে প্রায় সবাই ভালো রান করেছিলো। উমরিগড় করলেন ২২৩, মঞ্জরেকার ১১৮, কৃপাল সিং অপরাজিত ১০০, ভিনু মানকড় ৩০, ব্যতিক্রম শুধু পঙ্কজ রায়। ভারত চার উইকেটে ৪৯৮ রান করে ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছিলো। নিউজিল্যাণ্ড করেছিল ৩২৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ১৩৭। প্রথম টেস্টে ভালো ব্যাট করার স্বীকৃতি পেলেন পলি উমরিগড় পরবর্তী টেস্টগুলিতে। গোলাম আমেদের বদলে অধিনায়ক হলেন উমরিগড়। ভারতীয় দল গঠনে উমরিগড় প্রস্তাব দিলেন পঙ্কজকে দিয়ে আর চলবে না। কারণ পঙ্কজ চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। আর তাছাড়া বিজয় মেহেরা, নরী কন্ট্রাক্টর এরা সব রণজি ট্রফিতে ধারাবাহিকভাবে ভালো ব্যাট করে চলেছেন। কথাটি ঠিক, পঙ্কজ ঐ সময় চশমা নিয়েছেন। আর মেহেরা ও কন্ট্রাক্টর ভালই ব্যাট করছেন। কিন্তু যে খেলোয়াড়টি আগের সফরে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেছেন তাকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন কেন? দুর্ভাগ্য পঙ্কজের। চশমা নেওয়ার ফলেই নিন্দুকদের পক্ষে রটনা করা সুবিধে হলো পঙ্কজ তার স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। কারণ চশমা পরে নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রথম টেস্টে তিনি খেলেছিলেন। পঙ্কজ আসলে কিন্তু চশমা নেওয়ার কথা আদৌ ভাবেন নি। ঠনঠনে কালীবাড়ীর পাশেই বন্ধু অলোক ঘোষের চেম্বার।

একদিন মাকে চোখ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন বন্ধুর কাছে। ঐ সময় ঠাট্টার ছলে বন্ধুকে বলেছিলেন 'কি হে আমার চোখটা একটু দেখবে না কি ? পঙ্কজ হাল্কা ছলে কথাটা বললেও বন্ধু চোখ পরীক্ষা করে পঙ্কজকে জানালেন 'এখনই চশমা নেওয়ার প্রয়োজন। চোখের পাওয়ার মাইনার্স ওয়ান। চোখের এই অবস্থায় পাকিস্তানের সিম বোলারদের বিরুদ্ধে যখন স্বচ্ছন্দে খেলেছো তখন নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে চশমা পরে খেললে আরো ভালভাবে বল দেখতে পাবে।' বন্ধুর কথায় পঙ্কজ চশমা নিলেন। কিন্তু সেই চশমাই কাল হলো। দ্বিতীয় টেস্টে পঙ্কজ রায়ের জায়গায় বিজয় মেহেরা দলভুক্ত হলেন। মেহেরা করলেন মাত্র দশ রান। আগের টেস্টে উমরিগড় করেছিলেন ২২৩। এই টেস্টে ঐ একই রান করলেন মানকড়। দ্বিতীয় টেস্টে ভারত জিতলো ইনিংস ও ২৭ রানে। তৃতীয় টেস্টেও পঙ্কজ দলভুক্ত হলেন না। ভারতীয় দলের ইনিংস শুরু করেছিলেন মেহেরা ও কন্ট্রাক্টর। মেহেরা করেছিলেন ৩২। কন্ট্রাক্টর ৬২। চতুর্থ টেস্ট কলকাতায়। স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা পঙ্কজের কথা ভাবলেন। পলি উমরিগড়ের যুক্তি চশমা পরে নতুন বলে পঙ্কজ ভালো দেখতে পাচ্ছেন না। আর তাছাড়া কন্ট্রাক্টর আগের খেলায় ভালো খেলেছেন। প্রথম টেস্টের তুলনায় বিজয় মেহেরা তৃতীয় টেস্টে ভালো ব্যাট করেছেন। এছাড়া তো দলে রয়েছে মানকড়। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো বিজয় মেহেরা দল থেকে বাদ যাবেন। পঙ্কজ খেলবেন তিন নম্বর জায়গায়। ইডেনে ভারত প্রথম ইনিংসে শোচনীয় ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দিল। টসে জিতে সর্বসাকুল্যে সংগ্রহ করলো ১৩২ রান। দলের পক্ষে সবচেয়ে বেশী রান করলেন ঘোড়পাড়ে (৩৯)। পঙ্কজ করলেন মন্দের ভালো ২৮। নিউজিল্যাণ্ড প্রত্যুত্তরে করলো ৩৩৬ রান। ২০৪ রানে পিছিয়ে থেকে ভারত যখন দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামলো তখন ইডেনে উপস্থিত দর্শকদের মুখে একটাই প্রশ্ন

ভারত কি এ খেলায় পরাজয় এড়াতে পারবে। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত করলো এক উইকেটে ১০৭। চতুর্থ দিন সকালে পঙ্কজ একটি স্মরণীয় ইনিংস উপহার দিলেন। নিজে করলেন ১০০ আর মঞ্জরেকারের সহায়তায় তৃতীয় উইকেট জুটিতে যোগ করলেন ১৪৪ রান। ভারত পঞ্চম দিনে সাত উইকেটে ৪৩৮ রান করে ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলো। নিউজিল্যাণ্ড দিনের শেষ অবধি খেলে করলো ৬ উইকেটে ৭৪। চতুর্থ টেস্টে পঙ্কজ প্রমাণ করলেন তার সম্বন্ধে যা রটানো হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়। কারণ প্রথম ইনিংসে যখন তিনি ব্যাট করতে আসেন তখন দলের রান সংখ্যা ছিল ১৩। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪০ রানে ভারত প্রথম উইকেটটি হারায়। পঙ্কজের ক্রীড়াদক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের ফলেই অধিনায়ক উমরিগড় পঞ্চম টেস্টে তাঁকে ও ভিনু মানকড়কে গোড়াপত্তন করতে নির্দেশ দেন। আর এখানেই পঙ্কজ করলেন ভিনুর সঙ্গে বিশ্ব রেকর্ড। নরি কন্ট্রাকটরকে ঐ খেলায় দলভুক্ত করা হয়েছিল। কন্ট্রাকটরকে অবশ্য আদৌ ব্যাট করতে হয় নি। কারণ মানকড় ও পঙ্কজ রায় প্রথম উইকেটেই ৪১৩ রান করেন। এর আগে ইংল্যাণ্ডের লেন হাটন এবং সিরিল ওয়াসব্রুক ৪৮-৪৯ টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জোহানেসবার্গ টেস্টে প্রথম উইকেটে তুলেছিলেন ৩৫৯। পঙ্কজই প্রথম আউট হলেন ১৭৩। হয়তো আরো বেশী রান করা সম্ভব হতো যদি না প্যাভিলিয়ন থেকে অধিনায়ক উমরিগড়ের নির্দেশ যেত 'Hit every ball'। পঙ্কজ তাই মাটিতে বল রেখে মারার বদলে উঁচু করে মারার চেষ্টা করেছিলেন। উমরিগড়ের নির্দেশ অবশ্য যুক্তিপূর্ণ। কারণ প্রতিপক্ষকে দুবার আউট করতে হবে। আর জয়লাভ করতে হলে কিছুটা দ্রুতগতিতে রান তোলারও প্রয়োজন। ভারত ৩ উইকেটে ৫৩৭ রানে ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে করে ২০৯. ফলো-অন হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে রান ওঠে ২১৯, ফলে ভারত এ খেলায়

জয়লাভ করে ইনিংস ও ১০৯ রানে। পঙ্কজ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে চারটি ইনিংসে করলেন ৩০১, ব্যাটিং গড় ৭৫.২৫। এর মধ্যে পর পর দুটি ইনিংসে সেঞ্চুরী, যে কোন খেলোয়াড়ের কাছেই এই সাফল্য আনন্দের। পঙ্কজের কাছে আরো বেশী। কারণ চশমা নেওয়ায় ঠিকমত বল দেখতে না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে যাঁরা পঙ্কজকে ভারতীয় ক্রিকেট থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পঙ্কজ ব্যাটের মাধ্যমে তার যোগ্য জবাব দিতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে ক্রিকেট বুকে নিজের নামের পাশে বিশ্ব রেকর্ডের কৃতিত্বে স্বাক্ষর রাখতে কৃতকার্য হয়েছেন।

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অসামান্য সাফল্যই পরবর্তী বছরগুলিতে পঙ্কজকে ভারতীয় দলে অপরিহার্য খেলোয়াড়রূপে প্রতিপন্ন করেছে। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত মোট ১৮টি টেস্টে প্রতিটিতেই পঙ্কজ ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছেন। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পঙ্কজ তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট খেলেন। উনিশশো ছাপান্নো সালে অস্ট্রেলিয়া দল সর্বপ্রথম ভারত সফরে আসে। সফরের তিনটি খেলার মধ্যে দুটিতে ভারত পরাজিত হয়। মাদ্রাজে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও পাঁচ রানে আর কলকাতার ইডেনে ৯৪ রানে, বোম্বের দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয় অমীমাংসিত ভাবে। দ্বিতীয় টেস্টে পঙ্কজ প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৩১ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৯। তিন টেস্ট সিরিজে ভারতের পক্ষে একজন ব্যাটসম্যানই সেঞ্চুরী করেছিলেন। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে রামচাঁদ করেছিলেন ১০৯। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে পঙ্কজ সেঞ্চুরীর কাছাকাছি এসেও শতাধিক রান করতে পারেন নি। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে বোম্বের প্রথম টেস্টে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্রুতগতি সম্পন্ন সিম বোলার হল ও গিলক্রিস্টের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তখন ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা তটস্থ। প্রথম ইনিংসে পঙ্কজ ব্যর্থতা দেখালেও দ্বিতীয় ইনিংসে দীর্ঘ সাত ঘন্টা উইকেটে থেকে পঙ্কজ দলকে পরাজয়ের

হাত থেকে রক্ষা করেন। ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামের দর্শকদের উপহার দিলেন সাহস ভরা ৯০ রানের ইনিংস। প্রথম টেস্টের মতো দ্বিতীয় টেস্টেও পঙ্কজ প্রশংসনীয় ভাবে ব্যাট করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে পঙ্কজ ও কন্ট্রাকটর যখন ব্যাট করছিলেন তখন মনে হয়েছিল হয়তো এ টেস্টেও ভারত পরাজয় এড়াতে পারবে। দ্বিতীয় ইনিংসে পঙ্কজের ৪৫ ও কন্ট্রাকটরের ৫০ রান সত্বেও ভারত সর্বসমেত করে ২৪০ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ভারত ঐ সফরে পাঁচটির মধ্যে তিনটিতে পরাজিত হয়েছিল আর সবচেয়ে শোচনীয়ভাবে কলকাতায় ইনিংস ও ৩৩৬ রানে।

উনিশশো উনষাট সালে ভারত গেল ইংল্যাণ্ডে। অধিনায়ক করা হলো ডি কে গাইকোয়াডকে। পঙ্কজকে করা হলো সহঃ অধিনায়ক। ভারত ঐ সিরিজের পাঁচটি টেস্টেই পরাজিত হয়। পঙ্কক প্রথম টেস্টে ভালই খেলেছিলেন। দুটি ইনিংসে করেছিলেন ৫৪ ও ৪৯। দ্বিতীয় টেস্টে পঙ্কজের উপর অধিনায়কের দায়িত্ব পড়ে। ভারত ঐ টেস্টে ৮ উইকেটে পরাজিত হলেও একসময় ভারতেরই জয়ের সম্ভবনা ছিল। সেটা সম্ভব হয়নি বোম্বের নামী খেলোয়াড়দের জন্য। স্লিপে দাঁড়িয়ে যেভাবে সহজ ক্যাচগুলো মাটিতে ফেলে দিয়েছেন তা দেখে শুধু পঙ্কজই বিস্মিত হননি, বিলেতের বিভিন্ন সংবাদপত্র ভারতের ফিল্ডিংয়ের সমালোচনা করেছিলেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ঐ সময় প্রস্তাব দেওয়াও হয় পাঁচ দিনের বদলে ভারতের সঙ্গে তিন দিনের টেস্ট খেলার ব্যবস্থা করা হোক।

ইংল্যাণ্ডে ব্যর্থতা দেখালেও ঐ বছর স্বদেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত কিন্তু ভালোই খেললো। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতলো দুটিতে। দুটি খেলা শেষ হলো অমীমাংসিত ভাবে আর কানপুরে ভারত হারালো অস্ট্রেলিয়াকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের ওটাই ছিল প্রথম সাফল্য। কোন একটি খেলার মাধ্যমে

কেউ কেউ বিখ্যাত হয়ে যান। ভারতের জেসু প্যাটেলের ভাগ্যে তেমন একটি ঘটনা ঘটলো এই কানপুর টেস্টে। জেসু প্যাটেল টেস্ট খেলেছেন সাতটি। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি (১৯৫৬ সালে দুটি ও ১৯৫৯ ৩টি)। নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি করে। যে প্যাটেল ১৯৫৬ সালে প্রথম দুটি টেস্টে উইকেট পেয়েছিলেন মাত্র তিনটি এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটিও না, সেই প্যাটেল কানপুরে বোলিংয়ে এক অসাধারণ নজীর রাখলেন। তিনি প্রথম ইনিংসে পেলেন ৯টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫টি উইকেট। কানপুরের এটি ছিল দ্বিতীয় টেস্ট। দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে ইনিংস ও ১২৭ রানে। প্রথম ইনিংসে ভারত করে ১৩৫, দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৬। এর মধ্যে পঙ্কজের রান হলো ৯৯। পঙ্কজের খেলোয়াড়ী জীবনে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা যখন তিনি দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় তখন তিনি ১৯টি টেস্টের একটিতেও সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। আর দু-দুবার সেঞ্চুরীর দোঁড়গোড়ায় এসেও শতরানে বঞ্চিত হয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১০ রানের জন্য সেঞ্চুরী লাভে ব্যর্থ হন। পরের বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র এক রানের জন্য বিফল হন। পঙ্কজ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বোম্বেতে ১৯৬০-৬১ সালে জীবনের শেষ টেস্টে করেছিলেন ২৩ রান।

পঙ্কজ ১৯৬০ সালে টেস্ট থেকে বাদ পড়লেও রণজি ট্রফি খেলেছেন '৬৬ সাল পর্যন্ত। ১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত রণজি ট্রফি ক্রিকেটে পঙ্কজ রান করেছেন ৫,২৪৭। দুটি ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেছেন দুবার। দুবার পরপর চারটি খেলায় সেঞ্চুরী করেছেন। রণজি ট্রফিতে মোট সেঞ্চুরী করেছেন ২১ বার। ভারতীয় ক্রিকেট হাজারের ২২টি সেঞ্চুরী হচ্ছে রেকর্ড। পঙ্কজ ইচ্ছে করলে আরো কয়েক বছর রণজি

ট্রফিতে খেলতে পারতেন। হয়তো রেকর্ড বুকে নিজের নামটি খোদাই করতে পারতেন। কলকাতায় ইডেন উদ্যানে গিলক্রিস্টের বিরুদ্ধে দু-ইনিংসে সেঞ্চুরী করার পর অনেকেই ভেবেছিলেন নির্বাচক-মণ্ডলী হয়তো পঙ্কজকে আবার ডাকবেন।

১৯৬২ সালে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে নিয়ে আসেন চারজন সিম বোলারকে। উদ্দেশ্য, এদেশে সিম বোলার তৈরী করা এবং সেই সঙ্গে সিমবোলারদের বিরুদ্ধে খেলতে ব্যাটসম্যানদের রপ্ত করা। চারজন বোলারকে দায়িত্ব দেওয়া হয় চারটি অঞ্চলের উপর। গিলক্রিস্টের দায়িত্ব পড়ে দক্ষিণাঞ্চলের উপর। পূর্বাঞ্চলের দায়িত্ব নেন লেস্টার কিং। বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয় এইসব খেলোয়াড়েরা অঞ্চলের বিজয়ী দলের পক্ষে রণজি ট্রফিতে খেলতে পারবেন। হায়দ্রাবাদের সঙ্গে বাংলার রণজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা। পঙ্কজ তার আগে বিহারের বিরুদ্ধে করেছেন ১৭৮ রান। উড়িষ্যার বিরুদ্ধে ১১২। বাংলার খুঁটি যে পঙ্কজ তা গিলক্রিস্ট জানতেন। তাই খেলার আগেরদিন গিলক্রিস্ট বল নিয়ে লোফালুফি করতে করতে সহখেলোয়াড়দের জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আচ্ছা বলোত এর মধ্যে কোন বলটি পঙ্কজ রায়ের মাথা ফাটাবার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত? খেলার মাঠে যে কিছু ঘটতে চলেছে তা প্রথম দিনই গিলক্রিস্টের আচরণে বোঝা গেলো। পঙ্কজ যত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করছেন গিলক্রিস্টের আচরনে ততো বেশী হিংসতার পরিচয় মিলছে। শেষ পর্যন্ত ক্রিকেটের শালীনতা ভেঙ্গে দিয়ে গিলক্রিস্ট পিচের মাঝবরাবর এসে পঙ্কজের শরীর লক্ষ্য করে বল ছুঁড়লেন। নো বলে আউট না পাই অন্তত পঙ্কজকে আঘাত করা যাবেতো। গিলক্রিস্টের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে পঙ্কজ দুই ইনিংসে করলেন সেঞ্চুরী (১১২, ১১৮)। আর ঠিক তার পরে সেমি-ফাইনালে বোম্বের বিরুদ্ধে করলেন ৮১ ও ৩৭। সেই বছরই বোম্বের বিপক্ষে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে ইরানী ট্রফির খেলায় করলেন ১৪২।

পঙ্কজের এই ক্রীড়াদক্ষতায় ভারতীয় কর্মকর্তারা তাকে আবার টেস্ট দলে না ডাকায় পঙ্কজ কিন্তু দুঃখিত নন। জীবনে প্রত্যেকের এমন একটি সময় আসে যখন তাকে অবসর নিতে হয়। খেলোয়াড় জীবনেও তাই। কিন্তু অবসর নেওয়ার পথে খেলোয়াড়টি যদি মাথা উঁচু করে মাঠ থেকে বেরতে পারেন সেটাই হয় গৌরবের। পঙ্কজ খেলোয়াড় হিসেবে যে ক্রীড়াদক্ষতা তুলে ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী ক্রিকেটের গর্ব। লর্ডসের ঐতিহাসিক বলরুমে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের পাশে তাঁর ফটো স্থান পেয়েছে। ৭৫-এ পেয়েছেন পদ্মশ্রী। পরবর্তীকালে ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যও হয়েছেন। খেলার মাঠে প্রত্যেকেই তাঁকে আপন করে নিয়েছেন। কি স্বদেশী কি বিদেশী। যে গিলক্রিস্টের হাত থেকে বীমার ও বাউন্সারের ছর্‌রা তার উপর প্রতিফলিত হয়েছিল সেই গিলক্রিস্টের কালো হাতই হায়দ্রাবাদের সঙ্গে খেলার পরদিন নিউমার্কেটে পঙ্কজকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছিল। আর প্রীতির নির্দশন হিসেবে গিলক্রিস্ট পঙ্কজকে একটা উপহারও দিয়েছিলেন। ক্রিকেটার পঙ্কজের এখানেই সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা।

শেষ বাঙ্গালী সিমার

সুব্রত গুহ

টেস্ট ক্রিকেটে শেষ বাঙ্গালী সিম বোলার হচ্ছেন সুব্রত গুহ। সুব্রত মোট চারটি টেস্ট খেলেছেন। প্রথম টেস্ট ইংল্যাণ্ডে ১৯৬৭ সালে লর্ডস মাঠে। পরের তিনটি টেস্ট স্বদেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে। ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে ১৯৬৬-৬৭ সালেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সুব্রত দলভুক্ত হতে পারতেন। কলকাতা টেস্টের আগের খেলায় পূর্বাঞ্চলের হয়ে সুব্রতর মারাত্মক বোলিংয়ের ফলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আঞ্চলিক খেলায় পরাজিত হয়। ওই খেলায় চুনী গোস্বামীও ভাল বল করেন। কলকাতা টেস্টের আগের দিন সুব্রতকে দলে স্থান না দেওয়ার জন্য গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের সামনে একদল ক্রীড়ানুরাগী বিক্ষোভও জানিয়েছিলেন। দাবীর কাছে কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার না করলেও নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান শ্রী এম দত্তরায় আভাষ

দিয়েছিলেন সুব্রত পরবর্তী সিরিজে ভারতীয় দলে স্থান পাবেন। শ্রীদত্তরায়ের কথাতেই ঘটনাটি উল্লেখ করি। '৬৬-৬৭ সালে ইডেনে টেস্টের আগের দিন গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে বসে আছি। হঠাৎ হোটেল কর্তৃপক্ষ জানালেন বাইরে যে বিক্ষোভ ঘটছে তাতে হোটেলের নিরাপত্তার জন্য কর্তৃপক্ষের উচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। বিক্ষোভের কারণ সুব্রতকে টেস্ট দলে স্থান দিতে হবে। প্রতিনিধিদের বোঝালাম সুব্রত বছর দুয়েক হলো প্রথম শ্রেণীর খেলায় খেলছে। বড়ো আসরে খেলার মতো ওর এখনও মানসিক প্রস্তুতি ঘটেনি। সুব্রত আমার ক্লাবের (স্পোর্টিং ইউনিয়নের) খেলোয়াড়। ওর ভালো আমি চাই। আমার ইচ্ছে ওকে সামনের বছর ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় দলে স্থান দেওয়া। ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া সুইং বোলিংয়ের উপযোগী, আর খেলার সুযোগও মিলবে অনেক। প্রতিনিধিরা আমার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে স্থান ত্যাগ করেন।' শ্রীএম দত্তরায় তাঁর কথা রেখেছিলেন। সুব্রত ১৯৬৭ সালে ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হাঁটুর আঘাতের ফলে লর্ডসে একটি টেস্ট খেলেই তাঁকে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। স্বদেশে এসে অপারেশনের মাধ্যমে সুব্রত অবশ্য পায়ের ব্যথার উপশম ঘটান। সুব্রতর জীবনে দ্বিতীয় টেস্ট কানপুর মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া দুটি দলই ৬৯ সালে ভারত সফর করেছিল। তৎকালীন ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান বিজয় মার্চেন্ট একদল তরুণ খেলোয়াড়দের টেস্টে খেলার সুযোগ দিলেন। নিউজিল্যাণ্ড টেস্টে অম্বর খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুব্রতকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দলে স্থান দিয়েও শেষ পর্যন্ত সুব্রতর জায়গায় ভেঙ্কটরাঘবনকে দলভুক্তি করা হয়। এই ধরণের ঘটনা ক্রিকেটে বিরল নয়। তবু প্রথমে ১১ জন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করে পরে নির্বাচিত খেলোয়াড়কে বসানোর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে তরুণ ক্রিকেটারের মনের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বোম্বেতে

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগেই খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু খেলার দিন সকালে বিজয় মার্চেন্টের অনুরোধে সুব্রত সরে দাঁড়াতে রাজী হন। সুব্রতর স্থানে অন্তর্ভুক্ত হন ভেঙ্কটরাঘবন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সুব্রতকে দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত করা হয়। বাংলার অপর খেলোয়াড় অম্বর রায়কে করা হয় দ্বাদশ খেলোয়াড়। প্রথম টেস্টে ভারত আট উইকেটে পরাজিত হলেও কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে। এই টেস্টের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো প্রথম টেস্ট আবির্ভাবেই বিশ্বনাথের সেঞ্চুরী। বিশ্বনাথ প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে তাঁবুতে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নেমে দর্শকদের উপহার দিয়েছিলেন ১৩৭ রানের একটি উজ্জ্বল ইনিংস। ওই আসরে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দুটি দেশের মধ্যে বিশ্বনাথই প্রথম ব্যক্তি যিনি শতরান পূর্ণ করেছিলেন। সুব্রত গুহ প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন দুটি উইকেট। নেহাৎ উইকেট পাওয়ার উপর সুব্রতর ওই খেলায় বোলিং দক্ষতা বিচার করা ঠিক হবে না। কারণ অ্যালান চ্যাপল, ওয়ালটার্স, লরি, রেডপাথ, শ্যেহান সমৃদ্ধ শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে সুব্রত ২৯·২ ওভারে মাত্র ৫৫ রান দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সুব্রত দিয়েছিলেন পাঁচ ওভারে সাত রান।

দ্বিতীয় টেস্টে ভাল বল করায় দিল্লীতে তৃতীয় টেস্টে সব্রত আবার ভারতীয় দলে স্থান পান। অম্বর রায়কেও এই টেস্টে দলভুক্ত করা হয়। তৃতীয় টেস্টের শুরুতেই সুব্রত লরীকে বোল্ড আউট করেন। কিন্তু উইকেট মুখ্যতঃ স্পিন বোলারের সহায়ক থাকায় সুব্রতকে এই টেস্টে একটি উইকেট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে দুই নতুন বলের বোলার সুব্রত ও একনাথ সোলকার সর্বসমেত মাত্র তিন ওভার বল করেছেন। এই টেস্টে ভারত জয়লাভ

করে নয় উইকেটে। বেদী ও প্রসন্ন প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন চারটি করে উইকেট। ভেঙ্কটরাঘবন ও সুব্রত পেয়েছিলেন একটি করে উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে বেদী ও প্রসন্নর মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১০৭ রানে। দুজনেই দখল করে-ছিলেন পাঁচটি করে উইকেট।

তৃতীয় টেস্টের বিজয়ী ১১ জন খেলোয়াড়কে কলকাতায় চতুর্থ টেস্টে স্থান দেওয়া হয়। চতুর্থ টেস্টে ব্যাটে-বলে দুটিতেই ভারত ব্যর্থতা দেখায় এবং খেলায় পরাজিত হয় দশ উইকেটে। সুব্রত ও অম্বর রায়ের জীবনে এটাই ছিল শেষ টেস্ট। সুব্রত প্রথম ইনিংসে ১৯ ওভারে ৫৫ রান দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে বল করা ছিল নেহাৎই নিয়ম রক্ষার ব্যাপার। চতুর্থ দিনের শেষের দিকে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস যখন শেষ হলো তখন অস্ট্রেলিয়ার জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র ৩৯ রান। চতুর্থ দিনেই যাতে খেলা শেষ হয় তার জন্য কর্তৃপক্ষও ইচ্ছুক ছিলেন। কারণ খেলাটা যদি পঞ্চম দিন গড়ায় তাহলে খেলার মাঠে অশান্তি ঘটতে পারে বলে কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন। ওই টেস্টে খেলা দেখতে এসে ভিড়ের চাপে কয়েকজন তরুণ ক্রিকেট অনুরাগীর মৃত্যু ঘটে। ওই ঘটনার পর থেকে ইডেনে টেস্ট ক্রিকেটে দৈনিক টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নেওয়ার পরও সুব্রত গুহ রণজি ট্রফিতে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। রণজি ট্রফিতে দুশোর উপর উইকেটও পেয়েছেন। বোম্বের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ব্যাটে-বলে ভালো দক্ষতাও দেখিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী সুব্রতর দিকে ফিরেও তাকান নি। কারণ সুব্রতর তুলনায় আবিদ আলি ও সোলকার ব্যাটে-বলে ও ফিল্ডিংয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তবু ১৯৭১ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে আশা করা গিয়েছিল তৃতীয় সীম বোলার হিসেবে সুব্রত দলভুক্ত হবেন। কিন্তু সুব্রতর স্থানে গোবিন্দরাজ অন্তর্ভুক্ত হন।

সুব্রতর জন্ম ১৯৪৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী। ছোটবেলা থেকে খেলার উপর বাবা ও দাদার প্রভাব পড়েছিল। আন্তঃ রেলওয়ে ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে ট্রফি দেওয়া হয় সেটা সুব্রতর পিতার নামেই। দাদা সুজিত গুহ ইস্টবেঙ্গল ও স্পোর্টিং ইউনিয়নে দীর্ঘদিন খেলেছেন।

১৯৬৭ সালে ইংল্যাণ্ড সফররত ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে সুব্রত গুহ। দাঁড়িয়ে বাঁদিক থেকে—চিনস্বামী (বোর্ডের বর্তমান সভাপতি) ই এ এস প্রসন্ন, হনুমন্ত সিং, বি, পি চন্দ্রশেখর, এস ভেঙ্কটরাঘবন, অজিত ওয়াদেকার, সুব্রত গুহ, বেদী, ভি, সুব্রামনিয়াম, ও ফারুক ইঞ্জিনিয়ার।

নীচে বাঁদিক থেকে—রমেশ সাক্সেনা, ডি এন সরদেশাই, চাঁদু বোরদে, প্রফেসর চাঁদ গাদকর, বুঁদি, কুন্দরন, রুসি সুর্তি, ও এস মোহন

প্রতিভাধর ব্যাটসম্যান

অম্বর রায়

বাঙ্গালী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে প্রাতভাবান খেলোয়াড় ছিলেন অম্বর রায়। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় অম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেছেন, অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সর্ব ভারতীয় স্কুল ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এবং টেস্টের প্রথম আবির্ভাবেই ভারতীয় দলের পক্ষে তিনি ৪৮ রান সংগ্রহ করেন। কিন্তু মাত্র চারটি টেস্ট খেলার মধ্যেই অম্বরের টেস্ট জীবনের পরিসমাপ্তি। বলতে গেলে অম্বরের যা কিছু সাফল্য বা ব্যর্থতা তা ওই ১৯৬৯ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অম্বর দুটি টেস্ট খেলেছেন এবং ওই বছরই অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধেও দুটি খেলায় অংশ নেন। ১৯৬৯ সালের পর অম্বরকে টেস্ট ক্রিকেটে আর সুযোগ দেওয়া হয় নি। যদিও পরবর্তীকালে রণজি ট্রফি ও দলীপ ট্রফি খেলায় অম্বর ব্যাটের দাপট দেখিয়েছেন।

অম্বর রায়ের জন্ম ১৯৪৫ সালের ৫ই জুন। ছোটবেলা থেকেই বাবা অজিতলাল ও কাকা পঙ্কজের ক্রীড়াধারা বড়ো ক্রিকেট খেলোয়াড়

হওয়ার ব্যাপারে উজ্জীবিত করেছে। আর নীহার মিত্রও এগিয়ে এসেছেন অম্বরকে বড়ো ক্রিকেটার তৈরী করতে।

বড়ো আসরে অম্বরের প্রথম আবির্ভাব ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। জামসেদপুরে পূবাঞ্চলের হয়ে অম্বর ওই খেলায় অংশ নিয়েছিলেন। তখন অম্বর রণজি ট্রফি খেলার সুযোগ পান নি। ১৯৬২-৬৩ সালে অম্বর সিংহল সফরে ভারতীয় স্কুল দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। কিন্তু সিংহলে তখন পোলিও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায় শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজ থেকেই ভারতীয় দলকে ফিরে আসতে হয়। পরবর্তী তিন বছর অম্বরের ক্রীড়াদক্ষতার ফলেই ১৯৬৪-৬৫ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অম্বরকে বোম্বে ও দিল্লীতে দুটি টেস্টে ১৫ জনের মধ্যে ভারতীয় দলে স্থান দেওয়া হয়। পরবর্তী বছর অম্বর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে মাদ্রাজের চীপক মাঠে ১৩৫ রান করেন। এই খেলায় অম্বরের ব্যাটিংয়ের দ্যুতি দেখে অভীজ্ঞ ক্রীড়া-সাংবাদিক এন, এস রামস্বামী মন্তব্য করেছিলেন 'ক্রিকেট খেলার মধ্যে যে আনন্দ ছড়িয়ে আছে তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় অম্বরের ব্যাটিংয়ে। অম্বরের খেলা দেখে মনে হয়েছে সে সুন্দরের পূজারী, আর খেলার মধ্যেদিয়ে না গিয়ে যদি তিনি সাহিত্য, কলা ও সুরের আরাধনা করতেন তাহলেও আমার বিশ্বাস তিনি কৃতকার্য হতেন।'

অম্বরের জীবনের প্রথম টেস্টে ব্যাটিং দেখে প্রশংসা করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের দুই দিক্‌পাল বিজয় মার্চেন্ট ও লালা অমরনাথ। ১৯৬৪ সালে যে নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে অম্বরকে অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল সেই নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই অম্বর জীবনে প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৬৯ সালে। নিউ-জিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নাগপুরে অম্বরকে দ্বিতীয় টেস্টে খেলানো হয়। দলের ৭ উইকেট ১৬১ এই অবস্থায় খেলতে নেমে অম্বর অষ্টম উইকেটে ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগ করেন ৭৩ রান। টেস্টে প্রথম রান

সংগ্রহ করতে অম্বর সময় নেন ২২ মিনিট। কিন্তু তারপরই মাঠে বয়েছে রানের বন্যা। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময় অম্বর যখন তাঁবুতে ফিরলেন তখন অম্বরের ৩৩ রানের মধ্যে ৩২ রানই এসেছে বাউন্ডারী থেকে। ওই খেলায় অম্বরের পক্ষে হয়তো আরো কিছু রান করা সম্ভব হতো যদি না ইঞ্জিনিয়ার ও প্রসন্ন দ্রুত প্যাভেলিয়নে ফিরে না যেতেন। শেষ খেলোয়াড় বেদী মাঠে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অম্বর স্থির করলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রানকে এগিয়ে দিতে হবে। কিন্তু শেষ উইকেটে ৯৩ রান যোগ করার পরই অম্বর পোলার্ডের বলে বোল্ড আউট হন।

প্যাভেলিয়নের প্রবেশ মুখে অম্বরকে অভিনন্দন জানাতে উপস্থিত স্বয়ং বিজয় মার্চেন্ট। নির্বাচকমন্ডলীর চেয়ারম্যান মার্চেন্ট ওই বছর একাধিক তরুণ খেলোয়াড়কে টেস্টে স্থান দিয়েছিলেন। অম্বরের সাফল্য প্রকারান্তে মার্চেন্টের সাফল্য। তাই মার্চেন্ট খুশী। মার্চেন্টের আগে লালা অমরনাথ আকাশবাণী মারফৎ অম্বরের প্রশস্তি গেয়েছিলেন।

প্রথম ইনিংসে অম্বর ৪৮ রান করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে অম্বর দু-রান করে আউট হয়েছেন। আর পরের টেস্টে দুটি ইনিংসে অম্বর করেছেন মাত্র চার রান। হায়দ্রাবাদে এই তৃতীয় টেস্টে শুধু অম্বর নয়, ভারতের নামী ব্যাটসম্যানেরাও যে ব্যর্থ হয়েছেন তার প্রমাণ দুই ইনিংসে দলের রান সংখ্যা। (ভারত প্রথম ইনিংসে করেছিল ৮৯, দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৭৬। প্রথম ইনিংসে এক সময় ভারতের রান দাঁড়িয়েছিল সাত উইকেটে ২৮। এই খেলায় নিউজিল্যান্ড জয়ের মুখে এলেও শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি তাদের সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের দু সপ্তাহ বাদেই বোম্বেতে বসেছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট আসর। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটসম্যানের উপযোগী উইকেট থাকা সত্ত্বেও অম্বরের

দলে স্থান মিললো না। দ্বিতীয় টেস্টে অম্বরকে করা হয় দ্বাদশ খেলোয়াড়। দিল্লীতে তৃতীয় টেস্টে অম্বর এক ইনিংসেই ব্যাট করার সুযোগ পান। কিন্তু কোন রান করতে পারেন নি। কারণ ক্ষতবিক্ষত উইকেটে শুধু অম্বর নয়, কোন ব্যাটসম্যানই খেলতে পারেন নি। আর তারই জন্য একদিনে ১৭টি উইকেটের পতন ঘটে।

কলকাতায় পরের টেস্টে অম্বরকে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। দুটি ইনিংসে অম্বর করেন ১৮ ও ১৯ রান। ইডেনে অম্বর দুটি ইনিংসে যেভাবে ব্যাট করেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল অম্বরকে পরের খেলায় সুযোগ দেওয়া হবে। কারণ প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান পতৌদি, ইঞ্জিনিয়ার ও অশোক মানকড়ের চেয়ে অম্বর দুটি ইনিংসেই ভাল ব্যাট করেছিলেন। কিন্তু অম্বরকে আর টেস্টে ডাকা হয় নি। যদিও পরবর্তীকালে অম্বর দলীপ ট্রফিতে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করেছেন। রণজি ট্রফিতে একই মরশুমে সেঞ্চুরী করেছেন তিনটি। চন্দ্রশেখর ও প্রসন্নের বিরুদ্ধে রণজি ট্রফিতে ইডেনে তার সেঞ্চুরী কলকাতার ক্রীড়ানুরাগীরা দীর্ঘ দিন মনে রাখবেন। কলকাতা টেস্টে অম্বরের ব্যাটিং সম্বন্ধে 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের' তৎকালীন সম্পাদক পি এন সুন্দরেশন লিখেছিলেন। 'অম্বর নিঃসন্দেহে প্রতিভামান খেলোয়াড়। কলকাতা টেস্টে যেভাবে তিনি ওয়াদেকারের সঙ্গে ব্যাট করেছিলেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় কানপুরে অশোক গানদোত্রার জায়গায় তাঁকে খেলার সুযোগ দেওয়া হলো না। যদি দেওয়া হতো তাহলে ব্যাটসম্যান হিসেবে অম্বর দীর্ঘ দিন ভারতীয় ক্রিকেটকে সাহায্য করতে পারতেন। কানপুরে খেলার সুবাদে যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন বিশ্বনাথ ও সোলকার।'

রণজি ট্রফিতে বাংলা একবারই মাত্র সাফল্য লাভ করেছে। সাল ১৯৩৮-৩৯। বিজয়ী খেলোয়াড়দের নাম শেষ পৃষ্ঠায়।

শুরুতেই শেষ

আরো একজন বাঙ্গালী টেস্ট ক্রিকেটে খেলেছেন। খেলোয়াড়টির নাম এ কে সেনগুপ্ত। সেনগুপ্ত প্রবাসী বাঙ্গালী। ১৯৫৮ সালে মাদ্রাজ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সেনগুপ্তকে দলে স্থান দেওয়া হয়। ওই বছর সার্ভিসেস দলের পক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সেনগুপ্ত করেছিলেন সেঞ্চুরী। মাদ্রাজ টেস্টে মঞ্জরেকার ও গোপীনাথ শেষ মুহূর্তে অসুস্থ হওয়ায় সেনগুপ্তের পক্ষে দলে স্থান পাওয়াতে কিছুটা সুবিধে হয়। সেনগুপ্ত প্রথম ইনিংসে পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে গোড়াপত্তন করতে নেমেছিলেন। প্রথম ইনিংসে করেছিলেন এক, দ্বিতীয় ইনিংসে তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে নেমে আট রান করেন। এই টেস্টে জেসু প্যাটেলকে দলে স্থান দেওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় উমরিগড় অধিনায়কের পদ ত্যাগ করেন। উমরিগড়ের বদলে অধিনায়ক হন মানকড়। পরবর্তী টেস্টে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় হেমু অধিকারীর উপর। সেনগুপ্ত পঞ্চম টেস্টে ছিলেন দ্বাদশ খেলোয়াড়। সেনগুপ্তের জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩রা আগস্ট।

পেছনে দাঁড়িয়ে বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়জন—কমল ভট্টাচার্য, স্কিনার, এম দত্তরায় (আম্পায়ার), প্যাট্ মিলার, জিতেন ব্যানার্জী, নির্মল চ্যাটার্জী (ফাইনালে খেলেননি), তারা ভট্টাচার্য, ম্যালকম ও অতিরিক্ত খেলোয়াড় সি হজেস। চেয়ারে বসে—স্ট্যানলি বেরহেগু, অধিনায়ক টম লংফিল্ড, কোচ বিল্ হিচ, প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালেক হোসি (ফাইনালে খেলেননি) ও ভ্যাণ্ডারগুচ। মাটিতে বসে—জব্বর ও কার্তিক বসু।